কিশোর গ্রন্থাবলী

নরেন্দ্র দেব

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১৪, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ-শিল্পী :
শ্রীমৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়

ছবি :
শ্রীঅরুণ সেন,
শ্রীঅশোক ধর

মুদ্রণ :
শ্রীহরিপদ পাত্র
সত্যনারায়ণ প্রেস,
১, রমাপ্রসাদ রায় লেন,
কলিকাতা-৬

প্রকাশন :
শ্রীপরাণচন্দ্র মণ্ডল
ক্যালকাটা পাবলিশার্স,
১৪, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রকাশ :
১৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৭।

ব্লক তৈরী :
স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এন্‌গ্রেভিং,
১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ মুদ্রণ :
মোহন মুদ্রণী,
২, কার্ত্তিক বসু রোড,
কলিকাতা-৯

সূচী ঃ

উপন্যাস ঃ

নাটক ঃ

গল্প ঃ

প্রবন্ধ ঃ

কবিতা ঃ
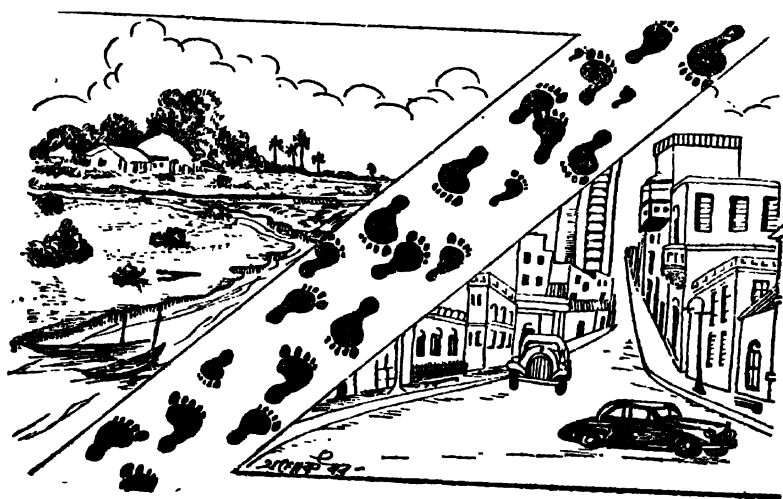
উপন্যাস

কাঠের পুতুল

প্রথম দিন

তার নাম সুখদেও। কাঠের কারিগর। যাদের আমরা ছুতোর মিস্ত্রি বলি। একসময় খুব ভালো কাজ করতে পারতো। এখন বুড়ো হয়েছে। খাটতে পারে না বেশি। স্ত্রী-পুত্র কেউ নেই তার। কাজ-কর্ম পায় খুবই কম। কাজেই, বড়ো গরিব সে।

অনেকদিন পরে একটা কাজ পেলে সে। একজন লোক তার চৌকির একটা ভাঙা পায়া মেরামত করতে দিয়ে গেলো। ভাঙা পায়াটা হারিয়ে গেছে। নতুন কাঠ দিয়ে পায়াটা তাকে ক'রে দিতে হবে।

সুখদেওর ঘরে কিন্তু কাঠ ছিলো না। সে অনেক খুঁজে জঙ্গলের ধার থেকে একটা ছোটো কাঠের গুঁড়ি কুড়িয়ে নিয়ে এলো। মেপে-জুপে দেখলে এই ছোটো কাঠের গুঁড়িটা চেঁছে-ছুলে নিলে চৌকির পায়া বেশ ভালোই হবে।

বসলো সে কুড়ুল নিয়ে গুঁড়িটা ছুলতে।

সুখদেওর হাতের কাজ খুব ভালো হ'তো। তাই সবাই তাকে 'ওস্তাদজি' ব'লে ডাকতো। কুড়ুলখানা বাগিয়ে ধ'রে সুখদেও যেই কাঠের গুঁড়িটাতে কোপ বসিয়েছে, কে ব'লে উঠলো, 'আহাহা! ওস্তাদজি! এত জোরে কুড়ুল চালিয়ো না। একটু আস্তে মারো।'

সুখদেও তো অনেক অবাক! তার হাতের কুড়ুল হাতেই র'য়ে গেলো।

কে একথা বললে? বড়ো-বড়ো চোখ ক'রে সে ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখতে লাগলো। কোথা থেকে এই আওয়াজ এলো?

কিন্তু ঘরের ভেতর সে কাউকেই দেখতে পেলে না। অথচ কথাগুলো সে স্পষ্টই শুনেছে। তখন তক্তাপোশের নিচে উঁকি মেরে দেখলে কেউ নেই

সেখানে। ঘরের কোণে একটা ভাঙা আলমারি ছিলো যার মধ্যে সে তার যন্ত্রপাতি, স্ক্রু, কব্জা, কাঁটা, পেরেক রাখতো; তার ভেতরও খুঁজে দেখলে—কেউ নেই। ঘরের একধারে একটা বড়ো ঝুড়িতে কাঠের কুচোগুলো জড়ো ক'রে রাখতো, উনুন ধরাবার সময় কাজে লাগে ব'লে। ঝুড়িটা উপুড় ক'রে ঝেড়ে দেখলে, নাঃ, কেউ লুকিয়ে নেই তার মধ্যে। তখন দরজার কাছে গিয়ে বাইরে রাস্তায় উঁকি মেরে দেখলে সেখানে কেউ দাঁড়িয়ে আছে কি না। সেখানেও কাউকে দেখতে পেলে না।

সুখদেও তখন মহা ভাবনায় পড়ে গেলো। কে তবে একটু আগে কথা বললে? সে যে কথাগুলো স্পষ্টই শুনেছে। এ তো ভারি আশ্চর্য ব্যাপার!

কিছুই ঠিক করতে না পেরে সুখদেও ভাবলে ওটা হয়তো তার মনের ভুল। চুলোয় যাক। এখন কাজটা তো শেষ করে ফেলি। খদ্দেরটা হয়তো সন্ধেবেলাই নিতে আসবে তার চৌকির পায়াটা। নইলে সে রাত্রে শোবে কেমন করে? এই ভেবে সুখদেও আবার কুড়ুলখানা বাগিয়ে ধরে মারলে সেই কাঠের গুঁড়ির গায়ে আর এক জবর কোপ।

'উহু-হু-হু! গেছি! গেছি! বড্ড লেগেছে ওস্তাদজি! আস্তে কুড়ুল চালাও!'

আবার সেই কণ্ঠস্বর! সুখদেও এবার নিজেই ভয়ে কাঠ! তার দুই চোখ যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। মুখ হাঁ হয়ে জিব ঠেলে বেরুচ্ছে। খানিকক্ষণ পরে সে যখন একটু ধাতস্থ হলো তখন ভাবতে চেষ্টা করলে কে অমন 'উহু-হু-হু!' করে চেঁচিয়ে উঠলো?

কোথাও তো কাউকে দেখতে পাওয়া গেলো না! তবে কি ওই কাঠের গুঁড়িটাই কথা বলছে? না-না, এ একেবারে অসম্ভব! কাঠের গুঁড়ি তো একটা মরা গাছের ডাল। ওর তো প্রাণ নেই। আগুনে ফেলে দিলে এখনি পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ওর ভেতর আর ঢুকে থাকবে কে? আর কেমন করেই বা ঢুকবে? দাঁড়াও, গুঁড়িটা মেঝেয় আছাড় মেরে দেখি, আবার কথা বলে কি না?

সুখদেও কাঠের গুঁড়িটা হাতে তুলে ধরে ভীষণ জোরে বার কতক ঘরের মেঝেয় আছাড় মারলে। কিন্তু কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেলো না এবার। তখন, সুখদেও ভাবলে কাঠের গুঁড়ির ভেতর যে আপদটা এসে ঢুকেছিলো

নিশ্চয় কুড়ুলের ঘা খেয়ে বিদেয় হয়েছে। সুতরাং এখন নির্ভয়ে চৌকির পায়াটা তৈরি করে ফেলা যাক।

এই ভেবে সে আবার কুড়ুল তুলে নিলে। কিন্তু তুলে নিলে কী হবে? সুখদেওর ভয় তখনো যায়নি। যদি কাঠের গুঁড়িটার মধ্যে কোনো ভূত এসে ঢুকে থাকে? সুখদেওর ভূতকে বড়ো ভয়। সে 'রাম' 'রাম' বলতে বলতে কুড়ুল রেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো। তারপর কী ভেবে র‍্যাদাটা নিয়ে কাঠের গুঁড়িটা চাঁছতে লাগলো।

কিন্তু আবার তার কানে এলো সেই কণ্ঠস্বর—'আহা-হা? করছো কী, চট্ করে সেরে নাও ওস্তাদজি! আমার বড়ো শুড়শুড়ি লাগছে!'

এবার সুখদেও একেবারে ভয়ে আঁৎকে উঠে মেঝের ওপর চিৎপটাং হয়ে শুয়ে পড়লো। সর্বশরীর তার ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। তার মুখ দিয়ে শুধ্ একটি কথা বেরুলো, 'আরে বাপ!'

এমন সময় কে যেন তার ঘরে এসে ঢুকলো। ডাকলে—'সুখদেও আছো নাকি?'

সুখদেও যেন ধড়ে প্রাণ পেয়ে ধড়-মড়িয়ে উঠে বসলো। বললে, 'কে! কে তুমি?'

লোকটি হেসে বললে, 'আমায় চিনতে পারলে না বুঝি? আমি তোমার বন্ধু সূর্যলাল!'

সূর্যলাল খোদাইকর শিল্পী। সে পাথরের মূর্তি আর কাঠের পুতুল তৈরি করে ভারি চমৎকার। এখন অবশ্য বুড়ো হয়ে পড়েছে। আর খাটতে পারে না। খোদাই ছেড়ে দিয়েছে। তবু, এখন কাঠের পুতুল এমন সুন্দর তৈরি করতে পারে যে লোকে দেখে অবাক হয়ে যায়। লোকটিকে দেখতে একটু বেঁটে মোটা গোলগাল। অনেকে তাই সূর্যলালকে 'পুলি পিঠে' বলে খ্যাপাতো। আর সূর্যলাল একেবারে রেগে আগুন হয়ে তাদের মারতে যেতো? 'পুলি পিঠে' বললেই সে একেবারে রাগে মরিয়া হয়ে উঠতো। রাগলে তার আর কাণ্ডজ্ঞান থাকতো না। ছেলেই হোক আর বুড়োই হোক—তেড়ে যেতো সে মারতে। নইলে অন্য সময় সে হেসেই কথা কয়।

সুখদেও কাজকর্ম ছেড়ে চুপ করে ঘরের মেঝেয় বসে রয়েছে দেখে সূর্যলাল আবার বললে, 'আরে ওস্তাদ, তোমার কী হয়েছে বলো তো? যন্ত্রপাতি ফেলে এমন চুপ করে ঘরের মেঝেয় বসে রয়েছো কেন? ব্যাপার কী?'

সূর্যলালকে চিনতে পেরে এবার সুখদেওর মুখেও হাসি ফুটলো। বললে, 'মেঝেয় বসে কী আর করবো দোস্ত, এই ডেঁয়ো পিঁপড়েগুলোকে অ-আ-ক-খ শেখাচ্ছি।'

সূর্যলাল বললে, 'বেশ করছো! ওতে তোমারও খুব উপকার হবে। বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ আর ভুলবে না!'

সুখদেও বললে, 'আরে ভাই, সব পরিচয়ই প্রায় ভুলিয়ে দিয়েছিলো আর একটু হলে! তা সে যাই হোক, হঠাৎ সকালবেলা আজ এ গরিবের ঘরের আঁধার আকাশে সূর্যোদয় হলো কেন? তোমাকে এখানে আনলে কে?'

সূর্যলাল বললে, 'আনবে আবার কে? আমারই এই ঠ্যাং দুটো!—এসেছি নেহাৎ পেটের দায়ে! তোমার কাছে একটু কৃপা ভিক্ষা চাই!'

'তা বেশ তো ভায়া. বলো না। বন্ধুকে অদেয় আমার কিছু নেই।'

সূর্যলাল খুশি হয়ে বললে, 'না না, এমন কিছু নয় ভাই, হাতে কাজকর্ম নেই। ট্যাঁকেও একটা পয়সা নেই। তাই, কী করা যায় ভাবতে ভাবতে মাথায় একটা খাশা মতলব এসে গেছে।'

'মতলবটা কী শুনি?' সুখদেও বললে!

সূর্যলাল বললে, 'না না, তেমন খুব একটা জবর মতলব কিছু নয়, তবে তুমিও তো বুড়ো হচ্ছো। বুঝতেই পারছো, রোজগারপাতি ক্রমেই কমে আসছে। দিন আর চলে না। আমি ঠিক করেছি, এবার এমন একটি চমৎকার কাঠের পুতুল তৈরি করবো যে নাচতে পারবে, লড়াই করতে পারবে, লাফ দিয়ে ডিগবাজি খেতে পারবে। সেই পুতুলটা নিয়ে আমি এদেশ ছেড়ে চলে যাবো। যে দেশে শিল্পীকে না খেয়ে উপোস করে দিন কাটাতে হয় সে দেশে আর থাকবো না। আমি সেই পুতুলটা নিয়ে দেশ-বিদেশে ঘুরে খেলা দেখিয়ে বেড়াবো, তাহলেই আমার একলার মতো দানাপানি মিলবে। কী বলো ওস্তাদ?'

'বেশ মতলব করেছো তো পুলি পিঠে, খাশা বুদ্ধি তোমার!' কে যেন কোথা থেকে বলে উঠলো। বোঝা গেলো না ঠিক।

'পুলি পিঠে' শুনেই সূর্যলাল খেপে উঠলো। কটমট করে সুখদেওর দিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি আমায় বাড়িতে পেয়ে অপমান করছো? তোমার তো স্পর্ধা কম নয়?'

সুখদেও অবাক হয়ে বলে, 'আমি তোমায় অপমান করলুম কখন? আমি তো কিছুই বলিনি।'

সূর্যলাল চেঁচিয়ে উঠে বললে, 'আলবৎ করেছো, এখনি আমায় তুমি 'পুলি পিঠে' বললে।'

'না না, আমি নই। আমি কেন বলতে যাবো?' সুখদেও থতমত খেয়ে বললে।

'তুমি বলোনি কি তবে ভূতে বলেছে? এঘরে তো তুমি আমি ছাড়া আর কেউ নেই। নিশ্চয় এ তোমার বদমাইশি। আমি বুঝতে পারিনি ভেবেছো?' ব'লে চোখ লাল করে সূর্যলাল চাইলে সুখদেওর দিকে।

'না-না, আমি নই, তুমি ভুল করছো। আমি কিছুই বলিনি।' বলে সুখদেও কাঁচু-মাচু হয়ে তাকালো সূর্যলালের দিকে।

সূর্যলালের সেই এক কথা। 'হ্যাঁ, তুমিই বলেছো। এ-ঘরে তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। এ তোমারই কাজ—'

'না, আমি নই!'

'হ্যাঁ তুমি।'

'না, কখনোই না। আমি একটা কথাও বলিনি!'

'আলবৎ বলেছো।'

'বলিনি!'

'হ্যাঁ, বলেছো।'

'তুমি মিথ্যেবাদী!'

'কী? আমি মিথ্যেবাদী? তবে রে বুড়ো—'

কথা কাটাকাটি হতে হতে শেষে দুই বুড়োয় হাতাহাতি শুরু হয়ে গেলো। চড়-চাপড়, ঘুষি, লাথি, বেদম চলতে লাগলো। শেষ পর্যন্ত জাপটা-জাপটি করে দু'জনেই দু'জনকে শুইয়ে ফেলতে চায় মেঝেয়। কিন্তু, কেউ কাউকে বাগাতে পারে না। বেশ খানিকক্ষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করে দুই বুড়োই হাঁফিয়ে উঠে যখন থামলো, দেখা গেলো সুখদেওর মাথার গোল টুপিটা

সূর্যলালের হাতের মুঠোয় তুমড়ে রয়েছে, আর সূর্যলালের মাথার খদ্দরের গান্ধিক্যাপটা সুখদেওর হাতের মুঠোয় চটকে রয়েছে।

'দাও, আমার টুপি ফিরিয়ে দাও,' হাঁপাতে হাঁপাতে বললে সুখদেও।

'আমারটাও তুমি ফিরিয়ে দাও!' দম নিতে নিতে বললে সূর্যলাল।

সুখদেও বললে, 'যখন টুপি বদল হয়ে গেলো তখন আর ঝগড়া নয়। আমরা আবার পরস্পরের বন্ধু হলুম, কী বলো?'

সূর্যলাল বললে, 'নিশ্চয়! তুমি ঠিক বলেছো ওস্তাদ! এসো, আমরা পরস্পরকে বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করি।'

আলিঙ্গনের পর সুখদেও বললে, 'আমার কাছে কী দরকারে এসেছিলে কিছু বললে নাতো ভাই।'

সূর্যলাল বললে, 'ও! হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওই যে বলছিলুম কাঠের পুতুলের কথা। আমার দরকার একটা ছোটো কাঠের গুঁড়ি। তোমার তো ভাই কাঠ নিয়ে কারবার। তা আমাকে যদি তুমি দয়া করে একটুকরো কাঠের গুঁড়ি দাও তাহলে আমি বেঁচে যাই।'

সুখদেও একথা শুনে খুশি হয়ে বললে, 'আরে এই কথা! তা বেশ! এখুনি দিচ্ছি। নিয়ে যাও।'

যে-গুঁড়িটায় কুড়ুলের ঘা দিতেই, ভেতর থেকে কে যেন কথা কয়ে উঠছিলো, সুখদেও তাড়াতাড়ি সেই গুঁড়িখানা তুলে সূর্যলালের হাতে গুঁজে দিতে গেলো। ঠিক সেই সময় কাঠের গুঁড়িটা সূর্যলালের হাঁটুতে এমন জোরসে চোট মারলে যে সূর্যলাল 'উহু-হু! গেছি, গেছি!' করে বসে পড়লো। কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললে, 'এমনি করেই বুঝি বন্ধুকে উপহার দিতে হয় ওস্তাদ? আমার ঠ্যাং যে তোমার মারের চোটে খোঁড়া হয়ে গেলো!'

'আমি দিব্যি গেলে তোমায় বলছি, আমার কথা বিশ্বাস করো দোস্ত, আমি তোমায় মারিনি।' কাতর হয়ে বললে সুখদেও!

'তবে কি তুমি বলতে চাও ভূতে আমায় মারলে?' রেগে উঠে সূর্যলাল বললে।

'না ভাই, আমি বলছি বিশ্বাস করো, দোষ আমার নয়। সব দোষ ওই সর্বনেশে কাঠের গুঁড়িটার।'

সূর্যলাল ধমক দিয়ে বললে, 'থামো! আর ন্যাকামি করতে হবে না! কাঠের গুঁড়ি দিয়ে সজোরে মেরে তুমিই তো আমার হাঁটুটা ভেঙে দিলে!'

সুখদেও কাঁচুমাচু হয়ে বললে, 'দোহাই দোস্ত! বিশ্বাস করো, আমি তোমায় মারিনি। মেরেছে ওই কাঠের গুঁড়িটা!'

'তুমি তো দেখছি ভারী মিথ্যেবাদী। একটা শয়তান!' ভীষণ রেগে উঠে সূর্যলাল বললে।

এবার সুখদেও রেগে উঠলো। বললে 'খবরদার! মুখ সামলে কথা বলো; এমন করে তুমি যদি আমায় অপমান করো, তাহলে পাড়ার ছেলেদের ডেকে শিখিয়ে দেবো তোমায় 'পুলি পিঠে' বলে খ্যাপাতে!'

'তুই একটা বুড়ো গাধা!' সূর্যলাল বলে উঠলো!

'আর তুই একটা আস্ত পুলি পিঠে! ছেলেরা ঠিকই বলে!'

'তুই একটা বুনো শূয়োর!'

'তুই পচা পুলি পিঠে!'

'তুই একটা বাঁদর!'

'তুই একটা বাসি পুলি পিঠে '

'তুই একটা উল্লুক!'

বার-বার এই 'পুলি পিঠে' শুনে-শুনে সূর্যলাল একেবারে রেগে খেপে সুখদেওর ওপর বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো। সুখদেও ছেড়ে দেবার লোক নয়। সেও ভীষণ একরোখা। লেগে গেলো দু'জনের ঝটাপটি, মল্লযুদ্ধ। কেউ কাউকে ছাড়ে না। শেষে দুই বুড়োই ক্লান্ত হ'য়ে লড়াই ছেড়ে হাপরের মতো ফোঁস-ফোঁস ক'রে হাঁপাতে লাগলো।

দেখা গেলো সুখদেওর গোল টুপি চ্যাপটা হ'য়ে গেছে আর সূর্যলালের গান্ধিক্যাপ খদ্দরের পুঁটুলি হ'য়ে গেছে। এর ফতুয়ার দুটো বোতাম উড়ে গেছে আর ওর মেরজাইয়ের একটা পকেট মাটিতে লুটুচ্ছে। একজনের নাকে কালশিরে আর গালে আঁচড় পড়েছে, আর একজনের কান ফেটে আর কপাল কেটে গেছে।

দু'জনে দু'জনের দিকে চেয়ে দেখে হেসে ফেললো। দু'জনেই বললো, 'তাইতো, কী ছেলেমানুষি করা হ'লো। যাকগে! আমাদের বন্ধুত্ব যেন এ জন্য নষ্ট না হয়। এসো ভাই আর-একবার আমরা কোলাকুলি করি।'

এই বলে দু'জনে পরস্পরের আলিঙ্গনাবদ্ধ হ'লো।

সুখদেও বললো, 'দোস্ত, তোমার কাঠের গুঁড়িটা নিয়ে যাও। পুতুল তৈরি হ'লে আমায় বোলো, দেখে আসবো।'

'নিশ্চয়! নিশ্চয়! তোমায় না-দেখিয়ে গেলে আমার মন কি শান্তি পাবে দোস্ত?' এই ব'লে কাঠের গুঁড়িটা কাঁধে তুলে নিয়ে 'রাম! রাম!' ব'লে সূর্যলাল সুখদেওকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে বাসায় চ'লে গেলো।

সুখদেও সঙ্গে-সঙ্গে দরজা পর্যন্ত এসে সূর্যলালকে রাস্তা অবধি এগিয়ে দিয়ে গেলো।

দ্বিতীয় দিন

সূর্যলাল থাকে একজনের বাড়ির নিচের তলায় পাশের একটা অন্ধকার ঘরে। সে-ঘরে একটিমাত্র ছোটো জানালা। সকালের দিকে সেখান দিয়ে একটু আলো আসে। তারপর সারাদিন ঝাপসা। ঘরে একখানি চারপাই ছাড়া আর কোনো আসবাবপত্র নেই। এক কোণে একটি কাঠের উনুন। তার ওপর একখানা ফুটো তাওয়া চাপানো রয়েছে। বোঝা যায় সূর্যলাল তাতে রুটি সেঁকে খায়। কিন্তু, ঘরের দেয়ালে সূর্যলালের আঁকা দু'তিন-খানা ছবি যা রয়েছে, দেখলে বোঝা যায় সূর্যলাল একজন নিপুণ শিল্পী। সুখদেওর কাছ থেকে সে যখন কাঠের গুঁড়িটা নিয়ে ফিরছিলো তখন তার ঘরে আর দিনের আলো ছিলো না। তাই পরের দিন ভোরে উঠেই সে তার কাঠের পুতুলটি তৈরি করতে বসলো।

পুতুল তৈরি করবার আগেই সূর্যলাল ভাবতে বসলো পুতুলটার কী নাম রাখবে। মেয়ে-পুতুল করবে, না ছেলে-পুতুল করবে? পুতুলটাকে যখন নাচতে হবে, খেলতে হবে, তরোয়াল ঘুরিয়ে লড়তে হবে, লাফাতে হবে, ডিগবাজি খেতে হবে, তখন এটাকে মেয়ে-পুতুল করলে চলবে না, খুব দস্যি একটা ছেলে-পুতুল করতে হবে।

এই ঠিক ক'রে সূর্যলাল তার বাটালি হাতুড়ি প্রভৃতি যন্ত্রপাতি নিয়ে বসলো। মনে-মনে ঠিক করলে, পুতুলটার নাম রাখবে সে 'বাজীকর!' এই 'বাজীকর' পুতুলটা থেকেই হয়তো তার ভাগ্য ফিরে যেতে পারে। 'বাজীকর' নামের বেশ একটা আকর্ষণও আছে। পুতুল-নাচে 'বাজীকরের' বাজি দেখতে অনেক লোক আসবে। সূর্যলাল তাদের কাছে মোটা-মোটা দর্শনি পেয়ে বড়লোক হ'য়ে উঠবে।

মহা উৎসাহে কাজ শুরু ক'রে দিলে সূর্যলাল। প্রথমেই পুতুলের মাথাটা তৈরি ক'রে ফেললে সে। ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া একমাথা কালো চুল। তারপর

তার ছোটো কপালখানি। তারপর ছুটি কান। কানের পরে সূর্যলাল ক'রে ফেললে তার সুন্দর দুটি পটলচেরা চোখ। কিন্তু চোখ শেষ হ'তেই সূর্যলাল অবাক হ'য়ে গেলো যে চোখ দুটি যেন জীবন্ত একটি ছেলের মতো! চোখের পাতা বুজছে, খুলছে। চোখের তারা নড়ছে, ঘুরছে। এদিক ওদিক চেয়ে দেখছে।

সূর্যলাল অনেকক্ষণ সেই কাঠের পুতুলের চোখের দিকে চেয়ে-চেয়ে দেখলে, চোখ দুটো যেন তারই দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। সূর্যলাল কাঠের পুতুলের এই বেয়াদপি দেখে চ'টে উঠে বললে, 'হারামজাদা পুতুল! তোর ওই কেঠো চোখ দুটো নিয়ে কেন আমার দিকে অমন ক'রে চেয়ে আছিস?' কিন্তু, কাঠের পুতুল তার এ-কথার কোনো জবাবই দিলে না।

সূর্যলাল তখন তার কাঠের পুতুলের নাকটা তৈরি করতে শুরু করলে। অনেক মেপেজুপে নাকটি যেই শেষ করলে অমনি দেখলে নাকটা আপনা-আপনি বাড়তে শুরু করেছে। বাড়তে-বাড়তে ক্রমে হাতির শুঁড়ের চেয়েও বড়ো হ'য়ে উঠলো। সূর্যলাল দেখলে পুতুলের নাকের বাড়টা কমবার কোনো লক্ষণই নেই। তখন বাধ্য হ'য়ে বাটালি নিয়ে সে নাকটা কেটে ছোটো করতে গেলো। কিন্তু সে এমন সর্বনেশে নাক যে সূর্যলাল যত বার কেটে ছোটো ক'রে দেয়; ততবারই নাকটা বেড়ে আগের চেয়েও বেশি লম্বা হ'য়ে উঠে!

সূর্যলাল তখন হতাশ হ'য়ে তার নাক কাটা ছেড়ে দিয়ে মুখের ঠোঁট দুটি আর দাঁত তৈরি ক'রে ফেললে। যেমনি ঠোঁট দুটি আর দাঁত হ'য়ে গেলো অমনি কাঠের পুতুল খিলখিল ক'রে হাসতে লাগলো। হাসি আর যেন থামে না।

সূর্যলাল কিন্তু সুখদেওর মতো ভয় না পেয়ে জোরে পুতুলটাকে এক ধমক লাগালো, 'চুপ কর বলছি হতভাগা! থামা তোর ওই কেঠো হাসি। মুখ ভেঙে দেবো!'

কিন্তু, কে তার সে-ধমক শোনে? কাঠের পুতুলের হাসি সমানে চললো।

সূর্যলাল তখন তার বড়ো হাতুড়িটা বাগিয়ে তুলে ধ'রে ভয়ানক ধমক

দিয়ে উঠলো, 'ভালো চাস তো হাসি থামা বলছি, নইলে হাতুড়ির এক ঘা'য়ে তোর মাথা ফাটিয়ে দেবো।'

এই ধমক খেয়ে কাঠের পুতুলের সেই বেদম হাসি এবার থামলো বটে, কিন্তু মুখ থেকে এক বিঘত জিভ বার ক'রে সূর্যলালকে ভেংচি কাটতে লাগলো।

সূর্যলাল যেন পুতুলটার জিভ বার ক'রে মুখ ভ্যাংচানি দেখতেই পায় নি এমনি ভান ক'রে পুতুল তৈরির কাজ শেষ করতে লাগলো। অধরোষ্ঠের পর চিবুক গড়লে। তারপর করলে কণ্ঠ আর স্কন্ধদেশ। তারপর দুটি হাত, বুক, পিঠ, কোমর শেষ ক'রে—ধরলে পা।

এমন সময় দেখলে কাঠের পুতুলটা টপ্ ক'রে সূর্যলালের মাথার গান্ধি-ক্যাপটা হাত বাড়িয়ে টেনে খুলে নিলে।

সূর্যলাল রেগে উঠে চীৎকার ক'রে বললে, 'দে বেটা বাজীকর, আমার টুপি ফিরিয়ে দে। এ-রকম অসভ্যতা করলে মেরে বিছিয়ে দেবো তোকে।'

কাঠের পুতুল বাজীকর সূর্যলালের এ-রাগারাগি চ্যাঁচামেচি কানেই তুললে না। টুপিটা ফিরিয়ে দেয়া চুলোয় যাক, দিব্যি ক'রে সে নিজের মাথায় প'রে নিলে।

সূর্যলাল তার নিজের হাতের তৈরি এই কাঠের পুতুলটার এই রকম অবাধ্য ব্যবহার আর অসভ্যতার পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত দুঃখিত হ'লো। জীবনে সে কখনো এত কষ্ট পায়নি মনে। বিরক্ত হ'য়ে বললে, 'তুই একটা অভদ্র বর্বর! এতটুকু একটা পুতুল, যাকে আমি সৃষ্টি করলুম এত মেহনত ক'রে—এত যত্ন ক'রে—সর্বাঙ্গসুন্দর রূপ দিলুম তোকে—আর তুই কিনা সজীব হ'য়ে উঠতে-না-উঠতে তোর বাপকে এমনি ক'রে অপমান করতে শুরু করলি। এটা মোটেই ভালো কাজ নয় রে ছোঁড়া। একটু সভ্য-ভব্য ভদ্র হবার চেষ্টা কর। নইলে, জীবনে বড়ো কষ্ট পাবি। এখনও তোর পা দুটো আমি শেষ করতে পারিনি। লক্ষ্মী ছেলের মতো ঠাণ্ডা হ'য়ে থাক একটু, আমি তোর পা দুটো তৈরি ক'রে ফেলি।'

সূর্যলাল বিশেষ যত্ন ক'রে কাঠের পুতুল বাজীকরের বেশ বলিষ্ঠ সুগঠিত দুটি পা তৈরি ক'রে ফেললে। পা যেই শেষ হয়েছে বাজীকর একটি পাকা ফুটবল খেলোয়াড়ের মতো 'কিক্' ঝাড়লে একেবারে সূর্যলালের নাকের ডগায়।

সূর্যলাল চোট খাওয়া নাকে হাত বুলুতে বুলুতে কাঁদো-কাঁদো হ'য়ে

বললে, 'আমার বোকামির উপযুক্ত ফল পেলুম? আগে ভাবা উচিত ছিলো তুই কী চরিত্রের ছেলে হয়ে উঠবি। যাকগে! এখন আর উপায় নেই। বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এ আমার আহাম্মুকির যোগ্য শাস্তি। অগ্র-পশ্চাৎ না ভেবে কাজ করলে, মানুষকে এমনিই ঠকতে হয়।'

তারপর কী ভেবে সূর্যলাল কাঠের পুতুলটার হাত ধরে তাকে হাঁটতে শেখাবার চেষ্টা করতে লাগলো। বাজীকর পা নাড়তে পারছিলো। কিন্তু চলতে শেখেনি। সূর্যলাল তাকে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে হাঁটতে শেখালে।

একটু পরেই সে নিজে-নিজেই হাঁটতে লাগলো। বেশ জোরে জোরে পা ফেলে প্রথমটা ঘরের মেঝেয় খুব খানিকটা হাঁটলে, তারপর আস্তে আস্তে ঘরের দরজা দিয়ে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালো। একবার ডান দিকে একবার বাঁ দিকে মাথা ঘুরিয়ে দেখলে। পথে তখন গাড়ি-ঘোড়া মোটরকার সাইকেল কিছু নেই দেখে, কাঠের পুতুল বাজীকর মারলে চোঁচা দৌড় বাঁ দিকের পথ ধরে ছুট-ছুট-ছুট! কে আর ধরে!

বাজীকরের কাণ্ড দেখে সূর্যলাল একটু অবাক হয়ে গেছলো প্রথমটা, তারপর সেও ছুটলো কাঠের পুতুলের পিছু-পিছু তাকে ধরবার জন্য। কিন্তু সূর্যলাল বুড়ো মানুষ। পারবে কেন ছেলে-ছোকরার পিছু-পিছু দৌড়ে তার নাগাল ধরতে।

বাজীকর ছুটছিলো যেন খরগোশের মতো তির-তির করে। তার কাঠের পা ফুটপাতের পাথরের ওপর 'খটাখট্ খটাখট্' আওয়াজ তুলছিলো।

হাঁপাতে-হাঁপাতে পিছু-পিছু ছুটছিলো সূর্যলাল। কিন্তু পারছিলো না কিছুতেই তার কাছে গিয়ে পৌঁছতে। শেষে চীৎকার করে রাস্তার লোকদের ডেকে বলতে লাগলো—'ধরুন! ধরুন! ধরুন মশাই! থামান ওই বিচ্ছু বাচ্চাটাকে! পালাচ্ছে বাড়ি থেকে—'

কিন্তু রাস্তার লোকেরা যখন সেদিকে চেয়ে দেখলে যে একটা কাঠের পুতুল দৌড়ুচ্ছে একেবারে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ার মতো সোজা রাস্তা দিয়ে, তারা অবাক হয়ে চেয়ে দেখে খুব হাসতে লাগলো, কেউ তাকে ধরবার জন্যে এক পা-ও এগুলো না।

বুড়ো সূর্যলাল আর ছুটতে পারলে না। বসে পড়লো রাস্তার ওপর।

আর কাঠের পুতুল 'বাজীকর' দেখতে দেখতে তার চোখের বাইরে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে দেখে সূর্যলাল ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে এলো। কাঠের পুতুল বাজীকরের জন্যে তার দুটি চোখ তখন জলে ভরে উঠেছে। হঠাৎ এই ভাগ্য বিড়ম্বনায় বেচারা বড়োই কাতর হয়ে পড়লো। কেমন করে তার দিন চলবে এই ভেবেই সে আকুল।

তৃতীয় দিন

পিছনে-পিছনে তার আর কেউ তাড়া করে আসছে না দেখে কাঠের পুতুল বাজীকর এইবার একটু বিশ্রাম করবার জন্যে একটা বাগানে ঢুকে গাছতলায় ঘাসের ওপর শুয়ে পড়লো আর অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লো। সারারাত আর তার ঘুম ভাঙেনি। পরদিন সকালে লোকজনের কলরবে তার ঘুম ভেঙে গেলো। সে কান পেতে শুনলে তারা বলতে বলতে যাচ্ছে—রামলীলার মেলায় আজ নাকি 'পুতুল-নাচ' হবে। তারা সব আজ মেলায় পুতুল-নাচ দেখতে যাবে। একজন বিখ্যাত পুতুল-নাচওলা এসেছে।

খবরটা কানে যেতেই বাজীকর চললো রামলীলার ময়দানের দিকে। যেখানে আজ পুতুল নাচ হবে সেইদিকের পথে।

মেলায় গিয়ে যখন সে পৌছলো তখন পুতুল নাচ শুরু হয়ে গেছে। পালা হচ্ছিলো 'রাবণ বধ'। কিন্তু একটু পরেই পুতুলনাচের যিনি কর্তা তিনি মঞ্চে এসে বললেন—'বড়োই দুঃখের সঙ্গে আপনাদের জানাচ্ছি যে আমাদের যে পুতুলটি হনুমান সাজতো সেটি হঠাৎ পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছে। পুতুলটিকে মেরামত করে নিতে একটু দেরি হবে। কারিগরকে আনতে লোক গেছে, তিনি এসে পড়লেই ব্যবস্থা হবে। তবে পুতুলটিকে মেরামত যদি না করা যায় তাহলে অবশ্য আমাদের আজ অন্য পালা দেখাতে হবে।'

বাজীকর একথা শুনেই একলাফে পুতুলনাচের মঞ্চের ওপর গিয়ে উঠলো। পুতুল নাচের কর্তাকে একটা নমস্কার ঠুকে বললে, 'অনুমতি করেন তো হনুমানের পার্টটা আমিই আজ আপনাদের চালিয়ে দিতে পারবো।'

বাজীকরের কথা শুনে দর্শকেরা সব আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠলো। পুতুল-নাচের কর্তার মুখে দুঃসংবাদটা পেয়ে তারা প্রায় হতাশ হয়ে পড়েছিলো। বুঝি 'রাবণ বধ' আজ আর দেখা হবে না, এই ভেবে তাদের মন খারাপ হয়ে গেছলো। বাজীকরের কথা শুনে তারা পুলকিত হয়ে উঠলো। তাদের মুখে আবার হাসি ফুটলো। তারা এবার খুশির হল্লা তুললে।

পুতুল-নাচের কর্তা বাজীকরকে ডেকে নিয়ে মঞ্চের আড়ালে পর্দার পাশে চলে গেলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'হনুমানের পার্ট কি তুমি আগে কখনো করেছো?'

বাজীকর বললে, 'আজ্ঞে—না!'

'তবে তুমি কোন সাহসে হনুমান সেজে নামতে চাচ্ছো?' জিজ্ঞেস করলেন পুতুল-নাচের কর্তা।

বাজীকর একমুখ হেসে বললে, 'এর জন্যে আবার সাহসের দরকারটা কী কর্তা? আমরা তো সবাই এক-একজন মুখ-পোড়া হনুমান। দেখুন না, চালিয়ে দিতে পারি কিনা!'

'আর যদি না-পারো?' গম্ভীর-ভাবে জানতে চাইলেন কর্তা।

'না-পারি তো শাস্তি দেবেন। তাছাড়া না-পারাটা তো আমারও লজ্জা! কিন্তু, যদি পারি, আর সবাই যদি আমার পার্ট দেখে খুশি হয় তাহ'লে আমায় কী পুরস্কার দেবেন, বলুন।'

পুতুল-নাচের কর্তা বললেন: 'তুমি যদি হনুমানের ভূমিকা এমন অপ্রস্তুত অবস্থায় হঠাৎ নেমে ভালো ক'রে করতে পারো, তাহ'লে তোমাকে আমি আজই একশো টাকা নগদ বখশিশ করবো।'

বাজীকর একটা ডিগবাজি খেয়ে ব'লে উঠলো, 'হুররে! দিন, পায়ের ধুলো দিন। চলুন, আর দেরি নয়, সাজ-ঘরে গিয়ে মেক-আপ ক'রে নিই। হনুমানের সীনটা কখন?'

পুতুল-নাচের কর্তা বললেন, 'এই তো—রাবণ সীতাহরণ ক'রে নিয়ে যাবার পরই সুগ্রীব-রামচন্দ্রের মিলনে হনুমানের সঙ্গে রামের পরিচয় হবে। তারপর, সমুদ্র-লঙ্ঘন, লঙ্কাদাহন, অশোকবনে সীতার সঙ্গে হনুমানের দেখা।'

'আপনি ভুল বললেন, কর্তা। আগে অশোক বনে জানকীর সঙ্গে হনুমানের দেখা, ফেরবার মুখে তো লঙ্কাদাহন। তাই না?' বাজীকর জিজ্ঞেস করলে।

পুতুল-নাচের কর্তা বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই, তাই হ'লো। তোমার দেখছি রামায়ণ পড়া আছে?'

বাজীকর জোড় হাত ক'রে বললে, 'আজ্ঞে না কর্তা, আমি কাঠের পুতুল! একেবারে নিরক্ষর! বর্ণ-পরিচয় হয়নি কখনো—'

'তবে তুমি এ-সব জানলে কী ক'রে?' কর্তা বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলেন।

বাজীকর বললে, 'আজ্ঞে, পাঠকজীর মুখে সন্ত তুলসীদাস বাবাজির 'রাম-চরিত-মানস' পাঠ শুনে আর রামায়ণের কথকতায় নিয়মিত গিয়ে এ-সব শিখেছি।'

'উত্তম! তবে, যাও, সাজ-ঘরে গিয়ে বীর হনুমানের রূপসজ্জা ক'রে নাওগে। দেখো, যেন পবন-নন্দনের মান থাকে।' কর্তা বললেন।

'যে আজ্ঞে কর্তা!' ব'লে আর-একটা নমস্কার জানিয়ে কাঠের পুতুল বাজীকর সাজ-ঘরের দিকে চ'লে গেলো।

পুতুল নাচ আবার শুরু হ'লো। রাবণ-বধের পালায় দেখা গেলো হনুমানের ভূমিকায় বাজীকরের অভিনয় সকলের চেয়ে ভালো উৎরে গেলো। যতবার হনুমান মঞ্চে আসে সমস্ত দর্শক করতালি দিয়ে প্রেক্ষাগার মুখরিত ক'রে তোলে। আজ পুতুল-নাচের আসরে একা হনুমানেরই জয়-জয়কার সবার মুখে।

শেষ দৃশ্যের পর যবনিকা পড়লো যখন, পুতুল-নাচের কর্তা বাজীকরকে ডেকে তার অভিনয়ের খুব প্রশংসা করলেন এবং তার পরিচয় জানতে চাইলেন। বাড়িতে কে-কে আছেন জিজ্ঞেস করলেন।

বাজীকর বললে, 'এক বুড়ো বাপ ছাড়া আর-কেউ নেই। বাবা যদিও একজন উঁচু দরের শিল্পী, কাঠের খোদাই-করা মূর্তি তাঁর মতো আর-কেউ করতে পারে না, কিন্তু তিনি এখন বুড়ো হ'য়ে পড়েছেন। আর তেমন খাটতে পারেন না। তাই কাজকর্ম বড়ো একটা পারেন না। আমি উপার্জন ক'রে তাঁর দুঃখ ঘোচাবো ব'লে তাঁকে কিছু না-জানিয়ে পালিয়ে এসেছি। তাঁর পরনে ছেঁড়া কাপড়। গায়ে শতচ্ছিন্ন ময়লা জামা। পায়ে জুতো জোটে না। পুরোনো গান্ধী-টুপিটা মাথায় তেল-তেল হ'য়ে গেছে।'

পুতুল-নাচের কর্তা বাজীকরের হাতে দশখানা করকরে নতুন দশ টাকার নোট গুঁজে দিয়ে বললেন, 'এই নাও বাজীকর, তোমার বখশিশ। আজ

তোমার অভিনয়ে দর্শকরা সবাই বেশ খুশি হয়েছেন। কাল তোমার ছুটি দিলুম। তুমি বাবার জন্যে নতুন জামা-কাপড় কিনে নিয়ে যাও। তাঁকে হাত-খরচের টাকা দিয়ে তুমি পরশু দিন চ'লে এসো। সেদিন আমাদের পুতুল-নাচে রাবণ-বধের পালা আবার হবে। তোমাকেই সেদিন হনুমান সাজতে হবে। চলো, আজ আমার বাসায় শুয়ে থাকবে। কাল ভোরে উঠে বাড়ি যেয়ো।'

বাজীকর 'যে আজ্ঞে!' ব'লে পুতুল-নাচের দলের অন্যান্য পুতুলদের সঙ্গে পরিচয় করতে গেলো।

চতুর্থ দিন

ভোরে উঠে বাজীকর চললো সূর্যলালের বাসার দিকে। হাতের মুঠোয় তার দশখানা দশ টাকার নোট, মোট একশো টাকা নগদ রয়েছে। তার ফুর্তি ছ্যাখে কে? খানিকটা পথ যায়, আর দাঁড়িয়ে পড়ে। হাতের মুঠো খুলে ছ্যাখে যে টাকাগুলো ঠিক আছে কিনা।

এমন সময় রাস্তার একটা মোড় পার হ'য়ে পাশের গলিতে ঢুকতেই দুটি লোকের সঙ্গে তার দেখা হ'য়ে গেলো। একজন কানা আর-একজন খোঁড়া। খোঁড়া লোকটি কানাকে হাত ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিলো। বাজীকরের মনে হ'লো এদের যেন একটু আগে বড়ো রাস্তায় ভিক্ষে করে বেড়াতে দেখেছে।

লোক দুটি তার সামনে এসে নমস্কার ক'রে বললে, 'আপনি কি বাড়ি যাচ্ছেন বাজীকরবাবু?'

বাজীকর শুনে চমকে উঠলো। ভাবলে এরা বোধ হয় কিছু ভিক্ষে চায়। কিন্তু তার কাছে তো খুচরো পয়সা কিছু নেই। সবই দশটাকার নোট। কী করে ওদের ভিক্ষে দেবে? কিন্তু সব চেয়ে আশ্চর্য হলো সে এই ভেবে যে এরা তার নাম জানলে কী ক'রে? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'আপনারা কে? আমার নাম জানলেন কী করে?'

খোঁড়া লোকটি বললে, 'আজ্ঞে, আপনার বাবার কাছে থেকেই শুনলুম। তাঁর সঙ্গে আমাদের খুব জানাশোনা হয়েছে কি না!'

'তাঁর সঙ্গে কোথায় আলাপ হলো আপনাদের?' জানতে চাইলে বাজীকর।

'আজ্ঞে, তাঁর বাড়িতে আমরা কাল গেছলুম কিনা, তাই তিনি আপনার কথা আমাদের বললেন।' খোঁড়া জবাব দিলে।

বাজীকর ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'তিনি কেমন আছেন? কী করছেন দেখলেন?'

'কী আর করবেন। ছেঁড়া জামা গায়ে এই শীতে ঠকঠক করে কাঁপছেন।' বললে খোঁড়া লোকটা।

'আহা! বাবা আমার বড়ো গরিব। বড়ো কষ্ট পাচ্ছেন। কিন্তু আর তাঁকে কষ্ট পেতে হবে না। আর তাঁকে শীতে কাঁপতে দেবো না'—বললে বাজীকর।

খোঁড়া জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি ছেলেমানুষ, তুমি কী করে তাঁর দুঃখ দূর করবে?'

বাজীকর বললে, 'আমি, আর ছেলেমানুষ নই। আমি এখন রোজগেরে মানুষ। নিয়মিত উপার্জন করছি।'

'তুমি তো কাঠের পুতুল! তুমি আবার রোজগেরে মানুষ হলে কবে? তোমার কর্ম নয় উপার্জন করা।' বলে খোঁড়া খুব হাসতে লাগলো; কানা সেই হাসিতে যোগ দিলে।

বাজীকর রেগে উঠে বললে, 'অত হাসির কী পেলে আমার কথায়? বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? চোখে দেখলে তো বিশ্বাস হবে? এই ছাখো আমার হাতের মুঠোয় এক-আধটা নয়, একেবার একশো টাকা রয়েছে। দশখানা করকরে দশ টাকার নোট।'

বাজীকরের হাতে দশখানা দশ টাকার নোট দেখে খোঁড়ার খোঁড়া পা যেন চট্ করে খাড়া হয়ে উঠলো, আর কানার চোখ দুটো হঠাৎ যেন একবার ড্যাবড্যাব করে জলে উঠলো। কিন্তু সে এমন চট করে হয়ে গেলো যে বাজীকর তা দেখতেই পেলে না। খোঁড়া আবার খোঁড়াতে লাগলো আর কানাও চোখ বুজে রইলো।

তারপর কানা জিজ্ঞেস করলে, 'তা ভাই, তুমি এত টাকা নিয়ে কী করবে ভাবছো?'

'কেন? সবার আগে আমি এই টাকাতে আমার বাবার জন্য নতুন জামা কাপড় কিনে দেবো। বাবার জামায় লাগাবার জন্যে রূপোর বোতাম গড়িয়ে দেবো আর আমার লেখাপড়া শেখবার জন্য একখানা বর্ণ-পরিচয় প্রথম ভাগ, একখানা ধারাপাত আর লেখবার জন্যে শ্লেট পেন্সিল কিনবো।'

বাজীকরের কথা শেষ হবার আগেই খোঁড়া হেসে উঠে বললে, 'তুমি বই শ্লেট কিনবে? তোমার জন্য? তুমি লেখাপড়া করবে?'

'নিশ্চয়! লেখাপড়া না করলে মানুষ হবো কী করে? আমার ইচ্ছে আছে আমি স্কুলে ভর্তি হবো, আর খুব মন দিয়ে লেখাপড়া শিখবো, তবে তো মানুষ হবো। মূর্খ হয়ে থাকা মানেই তো অমানুষ হয়ে যাওয়া!' বাজীকর বললে।

খোঁড়া শুনে আবার খুব হেসে উঠে বললে, 'লেখাপড়া শিখে ঘোড়ার ডিম হবে। এই খ্যাখোনা আমার অবস্থা! লেখাপড়া শিখতে গিয়ে আমার ঠ্যাংটি খোঁড়া হয়ে গেছে!'

কানা অমনি সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলো, 'লেখাপড়া শিখতে গিয়েই তো আমার দু'টি চোখ অন্ধ হয়ে গেলো!'

বাজীকর ওদের কথা শুনে অবাক হয়ে একবার খোঁড়ার খোঁড়া পায়ের দিকে একবার কানার অন্ধ চোখ দুটোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো।

তারা তখন প্রায় অর্ধেকটা পথ চলে এসেছে। হঠাৎ খোঁড়া বাজীকরকে বললে, 'তুমি কি তোমার ওই একশো টাকাকে ডবল করে দু'শো টাকা করতে চাও?'

বাজীকর তার কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে বললে, 'সে আবার কী? তা কী করা যায় নাকি? আহাম্মুকের মতো কথা বলছো। একশো টাকা কখনো দু'শো হয়ে যেতে পারে?'

'আলবাৎ পারে!' খোঁড়া বললে, 'একশো টাকাকে দু'শো করা কী বলছো? পাঁচশো, হাজার—'

কানা বললে, 'দশ হাজার বিশ হাজারও করা যায় তোমার ইচ্ছে মতো। বুঝলে?'

'বুঝলাম।' বাজীকর বললে, 'কিন্তু কী করে করা যায় বলো। শুনেছি তো জুয়া খেলে অনেকে ধনী হয়ে উঠেছে। আবার অনেকে সর্বস্বান্তও হয়েছে।'

'না না না!' দু'জনেই প্রায় সমস্বরেই বলে উঠলো। জুয়া খেলা নয়! যদি সত্যিই তুমি জানতে চাও কী করে করা যায় তাহলে আমাদের সঙ্গে চলো—খুব সহজেই টাকা বাড়াতে পারবে।'

'কোথায় তোমরা আমাকে নিয়ে যেতে চাও?' বাজীকর জানতে চাইলে।

এবার দু'জনেই প্রায় একসঙ্গে বলে উঠলো—'তুমি কি কুবেরের ভাণ্ডারের নাম শোনোনি? আমরা তোমাকে সেই কুবেরের ভাণ্ডারে নিয়ে যাবো।'

বাজীকর শুনে কী যেন ভাবলে একটু, তারপর বেশ দৃঢ় কণ্ঠে বললে, 'না, আমি তোমাদের সঙ্গে যাবোনা। প্রায় বাড়ির কাছে এসে পড়েছি যখন, তখন বাবার কাছেই যেতে চাই। তিনি হয়তো আমার ফিরে আসার পথ চেয়ে প্রতীক্ষা করছেন। সেদিন আমি যখন তাঁর কথায় কান না দিয়ে, তাঁর বারবার কাতর ডাকে সাড়া না দিয়ে পালিয়েছিলুম, আহা! আমার বুড়ো বাপ হয়তো আমার জন্য কত কেঁদেছেন, কত হা-হুতাশ করেছেন। সত্যি! আমি তাঁর সঙ্গে নেহাৎ কুপুত্রের মতো ব্যবহার করেছি। পণ্ডিতেরা ঠিকই বলেন, পিতামাতার অবাধ্য ছেলেরা পৃথিবীর কোনো কাজে লাগে না। কথাটা মিথ্যে নয়। আমি বাবার কোনো কাজেই লাগতে পারিনি!'

খোঁড়া বললে, 'তা বেশ! তুমি তবে ঘরেই ফিরে যাও তোমার বাবার কাছে। কিন্তু তুমি হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেললে।'

কানা বললে, 'রাতারাতি বড়লোক হবার একটা অপূর্ব সুযোগ কিন্তু হেলায় হারালে।'

'এখনও ভেবে ছাখো বাজীকর, ভাগ্য ফেরাবার এমন সুবর্ণসুযোগ তোমার ভাগ্যে এসেও বিফল হলো।' বললে খোঁড়া।

কানা বললে, 'বিফল বলে বিফল। একেবারে সাতরাজার ধন হাতে পেয়েও ভোগ করবার সুযোগ হারালে।'

'সাতরাজার ধন?' বাজীকর একটু অবাক হয়ে ভাবতে বসলো।

'হ্যাঁগো হ্যাঁ! একেবারে সাত রাজার ধন!' কানা-খোঁড়া দু'জনেই বললে।

'সাত রাজার ধন? সে কত?' বাজীকর জিজ্ঞাসা করলে।

খোঁড়া বললে, 'সে অনেক! কোনো রাজার ভাণ্ডারে অত টাকা নেই।'

কানা বললে, 'গুনে কি তা শেষ করা যায়? অগুনতি টাকা।'

'গুনে শেষ করা যাবেনা—এত টাকা হবে এই একশো টাকা থেকে?' অবাক হয়ে বাজীকর জিজ্ঞেস করলে।

খোঁড়া বললে, 'পরীক্ষা করে দেখতে পারো।'

'কিন্তু কেমন করে তা সম্ভব হবে? আমার তো বিশ্বাস হচ্ছে না।'

'সে কি! সে কি! বিশ্বাস হচ্ছেনা কখনো বলতে আছে? জানো না শাস্ত্রে আছে, বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহুদূর!'

কানা বললে, 'তুমি আম, জাম, জামরুল গাছ দেখেছো? এক-একটা

গাছের ডালে-ডালে পাতার ফাঁকে ফাঁকে কত ফলের গুচ্ছ ফলে, তা কি গুনে শেষ করতে পারো ?'

খোঁড়া বললে, 'ঠিক তেমনি হবে। এই টাকাগুলো যদি তুমি আমাদের জাদুদীঘির দক্ষিণ পাড়ে পুঁতে রাখো, তাহলে ঠিক সাতদিন পরেই যেমন বীজ থেকে চারা গাছ জন্মায়, তেমনি অসংখ্য টাকার চারা গজাবে তোমার ওই এক-একখানির নোটের গোড়া থেকে। আর এই টাকার চারা কলমের গাছের মতো বড়ো হতে না হতেই ফল ধরে। আমার বিশ্বাস তোমার ওই করকরে নতুন নোটগুলো থেকে একরাত্রেই কলা বেরুবে। তারপর চারা গাছ মাথা নাড়া দিয়ে উঠতে না উঠতেই যেমন কলমের গাছে আম ধরে অজস্র, তেমনি টাকার গাছে মোহর ফলবে থোলো থোলো। অঘ্রানে যেমন চাষের খেতে অজস্র সোনার ধানের মঞ্জরী রোদে ঝলমল করছে আর হাওয়ায় দুলছে দেখা যায় তেমনি ওই জাদুদীঘির দক্ষিণ পাড়ের মাঠে দেখবে থান থান মোহর ফলে হাওয়ায় ঝম্‌ঝম্ করে বাজছে।'

কানা বললে, 'ঠিক সেই সময় রাত থাকতে উঠে জাদুদীঘির পাড়ে বড়ো বড়ো থলে নিয়ে যাও আর গাছ মুড়িয়ে মোহর তুলে স্যিয্যি ওঠবার আগে বাড়ি চলে এসো। ব্যস! একশো টাকা তোমার একদিনে একলাখ হয়ে ঘরে আসবে।'

এদের কথা শুনে বাজীকর এবার আহ্লাদে নেচে উঠে বললে, 'সত্যি বলছো তোমরা ? একশো টাকা আমার রাতারাতি এক লাখ হয়ে উঠবে ?'

'সত্যি কি মিথ্যে একবার পরীক্ষা করেই গ্যাখো না।' খোঁড়া বললে।

কানা বললে, 'তোমার যদি বিশ্বাস না হয় বেশতো, তুমি আগে না হয় শুধু দশ টাকাই জাদুদীঘির পাড়ে পুঁতে রেখে গ্যাখো না কী হয় ? দশ টাকা তোমার একরাত্রে দশহাজার মোহর হয়ে উঠবে!'

বাজীকর শুনে একমুখ হেসে হাততালি দিয়ে বলে উঠলো, 'বাঃ! তাহলে তো ভারি মজা হবে। আমি ওই টাকাটা পেলে কী করবো জানো ? সবার আগে তোমাদের দু'জনকে এক একহাজার মোহর দেবো। তারপর আমার গরীব বাবাকে পাঁচ হাজার দেবো। আর আমি নিজের খরচের জন্যে চার হাজার রাখবো।'

কানা আর খোঁড়া একসঙ্গে বলে উঠলো, 'না না না, আমরা কিছু নেবোনা, আমরা কেন তোমার সৌভাগ্যে ভাগ বসাবো ? তুমি কি মনে করো—আমরা

সেই লোভেই তোমাকে টাকা বাড়াবার উপায় বাৎলে দিলুম। আমাদের ইচ্ছে শুধু তোমার টাকা বাড়ুক, তুমি বড়োলোক হও।'

বাজীকর খুশি হয়ে বললে, 'অশেষ ধন্যবাদ! তোমরা খুব ভালো লোক দেখছি।'

'চলো তবে জাদুদীঘির পাড়ের দিকেই যাওয়া যাক। যেতে যেতেই দিন কেটে যাবে, সন্ধে হয়ে আসবে।'

চললো বাজীকর কানা খোঁড়ার সঙ্গে। ভুলে গেলো গরীব বুড়ো বাপের কথা, তাকে নতুন জামা কাপড় কিনে দেবার কথা, আর নিজের লেখাপড়ার জন্য বর্ণ পরিচয় প্রথম ভাগ আর শ্লেট পেন্সিল কেনবার কথা। তার সমস্ত মন জুড়ে লাখ টাকা পাবার স্বপ্নই চেপে বসলো।

পঞ্চম দিন

খোঁড়া আর কানার সঙ্গে বাজীকর চলছে তো চলেইছে। যেতে-যেতে প্রায় সন্ধ্যে হ'য়ে এলো। বাজীকর আর চলতে পারছে না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বেচারা। খিদেও পেয়েছে খুব। সামনে একটা চায়ের দোকান দেখতে পেয়ে সে সঙ্গীদের বললে, 'এসো, এখানে একটু বিশ্রাম করে কিছু খেয়ে নিয়ে তারপর যাবো। কেমন?'

কানা আর খোঁড়া তৎক্ষণাৎ রাজি। খোঁড়া বললে, 'খুব ভালো কথা! কেন না, জাদুদীঘি এখান থেকে অনেক দূর। যেতে-যেতে রাত দুপুর হয়ে যাবে। তারপর সেখানে ভোর রাত্রে আমাদের আবার আসল কাজটা সারতে হবে। নোট পুঁততে হবে।'

কানা বললে, 'এ অতি উত্তম প্রস্তাব। চলো, এখানে কিছু খেয়ে নিয়ে বিশ্রাম করে তারপর জাদুদীঘির পথে যাওয়া যাবে।'

তিন জনেই চায়ের দোকানে ঢুকলো। খোঁড়া চা-ওলাকে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার এখানে চায়ের সঙ্গে কিছু খেতে পাওয়া যাবে?'

চা-ওলা বললে, 'নিশ্চয় পাবেন। চায়ের সঙ্গে নাইস বিস্কুট দিতে পারবো, পাঁউরুটির টোস্ট দিতে পারবো—'

কানা তার কথায় বাধা দিয়ে বললে, 'না না না, টোস্ট বিস্কুট ও-সব খেতে চাইনে। আর কী দিতে পারবে, বলো?'

চা-ওলা বললে, 'আজ্ঞে পারবো—ডবল ডিমের বড়ো-বড়ো ওমলেট গরম

গরম ভেজে দেবো। দেখবেন, খেয়ে ভুলতে পারবেন না। আবার আসতে হবে এই দোকানে। পিঁয়াজের কুচি আর কাঁচা লঙ্কার কুচি দিয়ে এমন করে বানানো যে একখানা খেয়ে আবার চেয়ে নিতে হবে। এ ছাড়া 'মট্‌ন-চপ' আর 'ফাউল-কাটলেট'ও অর্ডার দিলে সঙ্গে সঙ্গে তৈরি করে দেবো।'

খোঁড়া একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে বললে, 'আমার তেমন খিদে নেই। চায়ের সঙ্গে ওই একটা ডবল ডিমের ওম্‌লেট দিলেই যথেষ্ট হবে।'

কানা বললে, 'আমার পেটটা আজ ক'দিন ভালো নেই। ডিমের ওম্‌লেট আর খাবো না! আমায় বরং তুমি ওই মট্‌ন চপ আর ফাউল কাট্‌লেট দু'খানা ভেজে দিয়ো চায়ের সঙ্গে।'

খোঁড়া এবার বাজীকরের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলে, 'তোমার কী খাবার ইচ্ছে বাবাজি?'

বাজীকর বললে, 'তোমরা যা খাবে আমিও তাই খাবো। আমার জন্যে নতুন কিছু করতে হবে না। এখন চট্‌ করে এক কাপ চা করে দিতে বলো। এতদূর হেঁটে এসে গলাটা শুকিয়ে গেছে।'

দেখতে দেখতে সব তৈরি হয়ে এসে গেলো। তারা অনেকক্ষণ বসে গল্প করতে-করতে খেলে। খাওয়া-দাওয়া আর বিশ্রাম শেষ হবার পর তারা তখন উঠলো, চা-ওলা তার বিল এনে দাঁড়ালো। খোঁড়া যে তার খিদে নেই বলছিলো, দেখা গেলো সে এগারো খানা ডবল ডিমের ওম্‌লেট খেয়েছে! আর কানা, যার পেটটা খারাপ আছে বলেছিলো, সে সাতটা 'মট্‌ন চপ' আর ন-খানা 'ফাউল কাট্‌লেট্‌' খেয়েছে! কাঠের পুতুল বাজীকর দেখা গেলো চা-বিস্কুট, আর দু-খানা টোস্ট ছাড়া আর-কিছুই খায়নি। চা-ওলার বিল হয়েছে মোট বারো টাকা ছাপ্পান্ন পয়সা। কানা আর খোঁড়া ধমকে উঠে বললে, 'চালাকি পেয়েছো? অত আমরা খাইনি! দশ টাকার বেশি এক পয়সাও দেবো না!'

খোঁড়া দু-পকেট হাতড়ে দেখে বললো, 'ওই যাঃ, দেখেছো! আমার মনিব্যাগটা ভুলে বাড়িতে ফেলে এসেছি।'

কানা চমকে উঠে বললে, 'এ্যাঁ! করেছো কী? তোমার মনিব্যাগে যে আমারও অনেক টাকা রেখেছিলুম! কী হবে এখন? দশ টাকা দেবে কোত্থেকে?'

খোঁড়া তখন মিনতি করে বাজীকরকে বললে, 'বিলের টাকাটা তুমিই এখন চুকিয়ে দাও। আমরা কালই তোমার পাওনা দশ টাকা মিটিয়ে দেবো।'

অগত্যা কাঠের পুতুল আর কী করবে। নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের সেই একশো টাকা থেকে চ-ওলার দশ টাকা শোধ করে দিলে। ভাবলে আজ ভোর রাত্রেই তো জাদুদীঘির পাড়ে নোটগুলো নিয়ে বন-মহোৎসব করবো, তারপর টাকার গাছ গজিয়ে যখন মোহর ফলবে থোলো-থোলো তখন ওদের যে-টাকাটা পুরস্কার দেবো বলেছি তা থেকে আমার ওই পাওনা দশ টাকা আমি কেটে নেবো। অবশ্য, ওরা যদি তার আগে আমাকে দশ টাকা শোধ করে দিতে না পারে তখন।

জাদুদীঘির পাড়ে ওরা এসে পৌছলো যখন রাত তখন প্রায় বারোটা। চারদিক অন্ধকার, নিস্তব্ধ। কোথাও কারুর সাড়া শব্দ কিছু পাওয়া যাচ্ছে না, সামনের পথ দেখা যাচ্ছে না। পাশের মানুষকেও ঠাওর হচ্ছে না। বাজীকর এক পা এক পা করে হাতড়ে হাতড়ে আন্দাজে যাচ্ছিলো খুব সাবধানে। পাছে হোঁচট খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে যায়। রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার যেন আরও গাঢ় হয়ে উঠলো। আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না সামনে। বাজীকর ভয় পেয়ে তার সঙ্গীদের ডাকলে। কিন্তু কারুর সাড়া পেলে না। আবার ডাকলে সে। এবার একটু চেঁচিয়ে।—'কোথায় গেলে তোমরা? আমি যে কিছুই দেখতে পাচ্ছি নে! তোমরা কি এগিয়ে গেছো? এসে আমার হাত ধরো—ভয় করছে!'

এমন সময় যমদূতের মতো দুটো লোক কোথা থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে তার দুটো হাত খুব জোরে চেপে ধরে ধমক দিয়ে কর্কশ কণ্ঠে বললে, 'এখানে মরতে এসেছিস কেন বেটা? টাকার গাছ পুঁততে বুঝি? কত টাকা আছে সঙ্গে? দে, বার করে দে এখুনি। নইলে প্রাণে মরবি!'

বাজীকর ভয়ে আঁৎকে উঠে দুই চোখ বড়ো-বড়ো করে চেয়ে দেখলে যে আপাদ-মস্তক কালো কাপড়ে ঢাকা দুটো দুর্দান্ত লোক তার দুটো হাত দু' দিক থেকে চেপে ধরেছে। অন্ধকারের চেয়েও কালো তারা।

লোক দুটো আবার গর্জে উঠলো। হুংকার দিয়ে বললে, 'শীগ্‌গির টাকাগুলো বার করে দে! নইলে তোকে মেরে খুন করে এখানে পুঁতে ফেলবো। কেউ জানতে পারবে না। জন্মের মতো শেষ হয়ে যাবি।'

সেই অন্ধকারের ভেতরও কালো কাপড়ে ঢাকা লোক দুটোর দু'জোড়া চোখ ভাঁটার মতো জ্বলছে, দেখলে বাজীকর। কাতর হয়ে করুণ কণ্ঠে বললে 'আমি সামান্য একটা কাঠের পুতুল। টাকা কোথায় পাবো?'

'তবে রে বেটা!' গর্জে উঠলো দু'জনে। 'দেখবি? এখনি মেরে তোকে কাঠের তক্তা বানিয়ে ছেড়ে দেবো। পুতুল জন্ম তোর ঘুচিয়ে দেবো! বার কর শীগ্‌গির টাকাগুলো!'

কাঠের পুতুল বাজীকর কাঁদো-কাঁদো হয়ে আবার বললে, 'বিশ্বাস করো আমার কাছে একটিও টাকা নেই! আমি কোথায় টাকা পাবো?'

'ওঃ! সহজে দিবিনে দেখছি টাকা বার করে? তবে আর কী করবো। মরবার জন্যে তৈরি হ—' বললে তাদের মধ্যে একজন।

আর একজন সে কথায় সায় দিয়ে বললে—'হ্যাঁ, তৈরি হ মরবার জন্য।'

'তোকে মেরে তারপর তোর বাপ-খুড়ো যে যেখানে আছে সবাইকে মেরে ফেলবো।' বললে আগের লোকটা।

'ওগো, না না, তোমরা আমার গরীব বুড়ো বাপকে মেরোনা। দোহাই তোমাদের। আমাকে মারো দুঃখ নেই। কারণ আমি তো একটা কাঠের পুতুল বইতো নয়। আমার বাবা নিতান্ত নিরীহ নির্দোষ ভালো মানুষ। শিল্পী তিনি,' বললে বাজীকর।
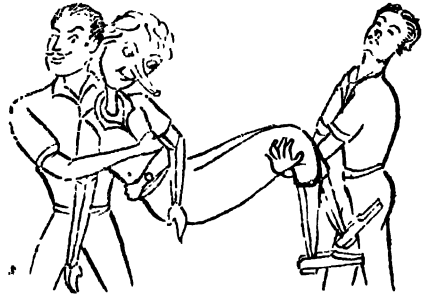
'চুপ কর ছোঁড়া! জ্যাঠামি করতে হবে না! টাকা বার কর নয়তো ইষ্টনাম জপ কর। এখনি এখানে তোকে সাবাড় করে ফেলি। ধরতো বেটাকে,'—বলে সেই কালো কাপড় ঢাকা ভূতের মতো লোক দুটো জাপটে ধরলে বাজীকরকে।

বাজীকর ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। শেষে বেগতিক দেখে যা থাকে কপালে বলে সেই লোকদুটোর একজনের একটা কান খুব জোরে কামড় ধরলে আর একজনের বুকে তার কেঠো পায়ের জোড়া লাথি সজোরে হাঁকড়ালে।

'ওরে বাপরে গেছিরে!' বলে কানকাটা লোকটা বাজীকরকে ছেড়ে কানে হাত বুলুতে শুরু করলে। আর দ্বিতীয় লোকটাও জোড়া পায়ের লাথি খেয়ে 'উঃফ্ মেরে ফেলেছে! বুক গেলো!' বলে বাজীকরের হাত ছেড়ে দিয়ে বুকে হাত বুলুতে লাগলো।

আর বাজীকর অমনি সেই ফাঁকে যে দিকে দু'চোখ যায় মরিয়ার মতো

প্রাণের দায়ে ছুটতে লাগলো সেই অন্ধকারের মধ্যেই জাদুদীঘির পাড় দিয়ে।

হাতের শিকার পালিয়ে যায় দেখে সেই কালো কাপড় ঢাকা ডাকাত দুটোও ছুটতে লাগলো তার পিছু পিছু—যেন দুটো নেকড়ে বাঘ একটা খরগোশের পিছনে ছুটছে।

খানিক দূর গিয়ে বাজীকর হাঁপিয়ে পড়লো। ভয়ে ঘেমে ভড়কে গিয়ে তার শরীর তখন কাঁপছে। পিছন ফিরে ছাখে সেই যমদূতের মতো লোক দুটো তার পিছনে বন্‌বন্‌ করে ছুটে আসছে। এই বুঝি নাগাল ধরে ফেললে তার।

বাজীকর সামনে একটা খুব উঁচু শাল গাছ দেখতে পেয়ে তর্‌তর্‌ করে উঠে তার মগডালে গিয়ে বসলো।

আর সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় সেই যমদূতের মত লোক দুটোও গাছতলায় এসে পৌছলো। একবার মুখ তুলে দেখলে তারা বাজীকর গাছটার একেবারে মগডালে উঠে বসে হাঁপাচ্ছে। হাঁপাচ্ছে কি ভয়ে কাঁপছে ঠিক বোঝা গেলো না।

পেছু-ধাওয়া করে আসা লোক দুটো তার কাণ্ড দেখে বললে, 'গাছে চড়ে বাঁচবে ভেবেছো? রোসো, তোমায় মজা দেখাচ্ছি। আমরাও গাছে চড়তে পারি।'

এই বলে তারাও দু'জনে দু'দিক থেকে শাল গাছের ডাল বেয়ে-বেয়ে উঠতে লাগলো। কাঠের পুতুলের প্রাণ ভয়ে ধুক ধুক করে কাঁপছে তখন।

লোক দুটো তখন প্রায় গাছটার মগডালে গিয়ে পৌছে দেখে বাজীকর তখন দুর্গানাম জপ করছে। আর রক্ষে নেই!

এখন সময় দেখা গেল হাত ফস্‌কে তারা দু'জনেই সড়সড় করে পিছলে একেবারে গাছের তলায় এসে পড়লো।

বাজীকর দেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'জয় ভগবান!'

ওরা দু'জনে গাছের তলা থেকে গর্জন করে বলে উঠলো, 'এই যে! দাঁড়াও না দেখছি তোমার ভগবান কে—তিনি কেমন করে তোমায় বাঁচান!'

এই বলে সেই যমদূতের মতো কালো কাপড় ঢাকা লোকদুটো কোথা থেকে একরাশ শুকনো পাতা আর গাছের ভাঙা ডাল সংগ্রহ করে এনে সেই শাল গাছের তলায় জড়ো করলে, তারপর দিলে তাতে আগুন ধরিয়ে। সেই পুরোনো

শাল গাছটার ডালপালায় অনেক কাক-পক্ষীর বাসা ছিলো। তারা সব আগুনের তাতে কলরব করে উঠলো।

বাজীকর বুঝলে এ-গাছে থাকা আর নিরাপদ নয়। এখনি আগুনের তাতে ঝলসে একেবারে বেগুন-পোড়া হ'য়ে মরতে হবে। তখন সে প্রাণের দায়ে বুদ্ধি ক'রে ঠিক হনুমানের মতো জোরসে এক লাফ দিয়ে কাছাকাছি পাশের আর-একটা শাল গাছের ডাল ধ'রে ফেলে, তরতর ক'রে গুঁড়ি বেয়ে নেমে এলো, আর মাটিতে পা ঠেকতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে দে ছুট সেই শাল বনের ভিতর দিয়ে উল্টো দিকে।

সেই দু-বেটা ভূতের মতো কালো খুনে লোক তাকে ওই ভাবে পাশের গাছ বেয়ে নেমে ছুটে পালাতে দেখে পিছু-পিছু তারাও দৌড়তে শুরু করলে। সে যেন দৌড়ের প্রতিযোগিতা—কে কার নাগাল ধরতে পারে।

ছুট্-ছুট্-ছুট্! বাজীকর ছুটছে শুধু তো টাকা বাঁচাতে নয়, ছুটছে তার প্রাণ বাঁচাতেও। কাজেই সে-লোক দুটো কিছুতেই নাগাল ধরতে পারছিলো না। প্রাণে মারবার যে উদ্যম তার চেয়ে প্রাণ বাঁচাবার উদ্যমের জোর অনেক বেশি। তাই বাজীকরকে কিছুতেই ওরা ধরতে পারছিলো না।

ছুটতে-ছুটতে রাত ক্রমে ভোর হ'য়ে এলো। পূর্বদিক ফর্সা হচ্ছে। কিন্তু সেই যমদূতের মতো লোক দুটো তখনও পিছনে ছুটে আসছে দেখে বাজীকর আরও জোরে দৌড় দিতে শুরু করলে, এমন সময় দ্যাখে সামনে একটা মস্ত নালা। ময়লা জলের স্রোত বইছে তাতে। জলটা যেন পাঁকে সবুজ হ'য়ে গেছে আর দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। নাকে কাপড় দিতে হয়। এখন কী উপায়। বাজীকর পিছন ফিরে দেখলে লোক দুটো প্রায় তার কাছে এসে পড়েছে। এই খানা পার হ'য়ে ওপারে না-যেতে পারলে তার আর রক্ষে নেই।

কিন্তু সেই নোংরা দুর্গন্ধ জলে সে নামবে কেমন ক'রে? সাঁতার সে ভালোই জানে কিন্তু ও-জলে কি মানুষ নামতে পারে? দেখেই তো তার গা ঘিন্-ঘিন্ করছে! আর একবার পিছন ফিরে দেখলে বাজীকর লোকদুটো প্রায় কাছা-কাছি এসে পড়েছে। বাজীকর শুনেছিলো বীর হনুমান না কি রামনাম ক'রে সাগর ডিঙিয়েছিলো। তার সেই কথা মনে পড়লো। সে তৎক্ষণাৎ রামনাম স্মরণ ক'রে ঠিক হনুমানের মতোই দিলে এক প্রচণ্ড লাফ।

জয়রাম! সে একেবারে এক লাফে খানা ডিঙিয়ে ওপারে গিয়ে পড়লো। তার দেখাদেখি লোক দুটোও লাফ দিতে গিয়ে ঝপাং ক'রে সেই নোংরা দুর্গন্ধ

জলের ভিতর প'ড়ে হাবুডুবু খেতে লাগলো। তাদেয় সেই অবস্থা দেখে সেই বিপদের মধ্যেও বাজীকর হো হো ক'রে হেসে উঠলো; না-হেসে থাকতে পারলে না। কিন্তু দাঁড়াবার সময় নেই তার। আবার ছুটতে শুরু করলে বাজীকর।

খানিক পরে পিছন ফিরে দেখে সেই পাঁকে-ভরা দুর্গন্ধ নোংরা জল মেখে এপারে উঠে লোক দুটো তার পিছনে ছুটে আসছে। তাদের সেই কালো আলখাল্লা থেকে তখনও পেঁকো জল ঝ'রে-ঝ'রে পড়ছে।

ছুট-ছুট-ছুট! কাঠের পুতুল বাজীকর ঠিক পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো ছুটছিলো!

ষষ্ঠ দিন

বন জঙ্গল মাঠ পেরিয়ে বীজকর যখন শহরের দিকে যে-পথে গেছে সেই পথে এসে পড়েছে, তখন বেশ সকাল হয়েছে। প্রভাত সূর্যের মিষ্টি নরম রোদ যেন তার স্নেহকর স্পর্শে নগর-বাসীদের চোখের ঘুম মুছে দিচ্ছে। বাজীকর একবার পিছনে চেয়ে দেখলে—না। আর কেউ তার পিছনে তাড়া ক'রে ছুটে আসছে না। সে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। কচি-কচি সবুজ পাতায় ঝামরে-পড়া একটি জাম-গাছের তলায় একটু বিশ্রাম নেবার জন্য যেই একটু বসেছে, অমনি শুনলে কারা যেন তার নাম ধ'রে ডাকছে।

সে চমকে উঠে চেয়ে ছাখে সেই তার আগের দিনের কানা খোঁড়া বন্ধু দুটি। একমুখ হেসে তারা বললে, 'ওমা! তুমি এখানে ব'সে? আর আমরা জাদু-দীঘির পাড়, মাঠ, বন সব তন্ন-তন্ন ক'রে খুঁজছি—তাই তো বীজকর কোথায় গেলো। সেই যে অন্ধকারে হারিয়ে গেলে আর তোমায় খুঁজে পেলুম না। অনেক অনুসন্ধান ক'রে শেষ পর্যন্ত হতাশ হ'য়ে মনের দুঃখে শহরে ফিরে আসছি। এমন সময় দেখি জাম-তলায় ব'সে রয়েছো তুমি। তা যাক, জাদুদীঘির পাড়ে টাকা পুঁতে রেখে এসেছো তো? কালই গিয়ে দেখতে পাবে তাহ'লে মোহর চারা গজিয়ে উঠেছে।'

বাজীকর লজ্জিত হয়ে বললে, 'ভাই, পারলুম না। একটা বিশ্রী দুর্ঘটনায় পড়ে সব ভেস্তে গেলো।'

'কী? কী? ব্যাপারটা কী ঘটেছিলো বলো তো শুনি?' দু'জনেই জানতে চাইলে।

বাজীকর বললে, 'সে এক ভয়ানক ব্যাপার। পরে সব বলবো—আমি সেই জাদুদীঘির পাড়ে দুটো খুনে ডাকাতের হাতে পড়েছিলুম বুঝলে!'

'খুনে ডাকাত?' কানা খোঁড়া শুনে চমকে উঠলো।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। তারা আমাকে মেরে আমার টাকাগুলো কেড়ে নিতে এসেছিলো। কিন্তু আমিও শক্ত ছেলে। কিছুতেই টাকা ছাড়িনি—'

'কী সর্বনাশ! এতবড়ো বিপদে পড়েছিলে বুঝি? আমরা থাকলে আর এ দুর্ঘটনা ঘটতো না। যে ঘুটঘুটে অন্ধকার! নিজেরাই নিজেদের দেখতে পাইনি তা তোমাকে আর খুঁজে পাবো কী করে? হ্যাঁ, ভালো কথা! সেদিন—সেই চা-ওলার দোকানে খাওয়ার দরুন যে দশটাকা ধার দিয়েছিলে সেটা তোমাকে ফিরিয়ে দেবো বলে নিয়ে এসেছি—'

বাজীকর বাধা দিয়ে বললে, 'না না, থাক; ও সামান্য কটা টাকা আর ফেরত দিতে হবে না। আমিও তো তোমাদের সঙ্গে খেয়েছিলুম।'

'আচ্ছা, খুনে ডাকাত দুটোর হাত থেকে তুমি উদ্ধার পেলে কেমন করে? কী ভীষণ বিপদই না গেছে তোমার?' বললে খোঁড়া।

'বিপদ—বলে বিপদ! সাংঘাতিক একেবারে!' বললে কানা।

বাজীকর বললে, 'সে যাকগে, কোনো রকমে ডাকাত দুটোর হাত থেকে টাকা বাঁচিয়ে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি! তারা আমার পিছু নিয়েছিলো। ভাগ্যে একটা শাল গাছে উঠে পড়েছিলুম তাই রক্ষে!'

ওরা দু'জনেই বলে উঠলো, 'ওমা তাইতো! কী কাণ্ড! এমনতর চোর-ডাকাতের রাজ্যে মানুষ বাস করে?'

হঠাৎ এই সময় কানার মাথার কানঢাকা টুপিটা হাওয়ায় উড়ে খুলে পড়ে যাওয়ায় বাজীকর দেখলে তার একটা কান কাটা। এখনও রক্ত শুকিয়ে জমে রয়েছে।

বাজীকর দেখে চমকে উঠে জিজ্ঞেস করলে, 'তোমার কানটা কী হলো?'

কানা এ প্রশ্নে শুনে যেন একটু ভড়কে গেলো। তাড়াতাড়ি কাটা কানে হাত চাপা দিয়ে থতমত খেয়ে খোঁড়ার মুখের দিকে চাইতে, খোঁড়া তার টুপিটা কুড়িয়ে দিলে, বাজীকরকে বললে, 'জানো না বুঝি? আমাদেরও কাল ভারি বিপদ গেছে। জাদুদীঘির পাড়ে তোমায় না খুঁজে পেয়ে পথ হাতড়ে হাতড়ে যখন ফেরবার চেষ্টা করছি তখন পথ ভুলে যে আমরা পাশের একটা জঙ্গলে ঢুকে পড়েছি, সেটা একেবারেই বুঝতে পারিনি। টের পেলুম যখন হুপ্ করে

একটা ভাল্লুক পাশের মহুয়া গাছের ডাল থেকে লাফ দিয়ে ওর কাঁধে পড়লো। ও তো অন্ধ মানুষ! অত বুঝতে পারেনি, গাছের ডালপালা ভেঙে পড়েছে মনে করে যেই হাত বাড়িয়ে টানতে গেছে অমনি ভাল্লুকটা ওর একটা কান দাঁতে কেটে নিয়ে আবার গাছের ডালে পালিয়ে গেলো। আহা! বেচারার কী কষ্ট! কী যন্ত্রণা কানের! বহুকষ্টে সেবা শুশ্রূষা করে ঠাণ্ডা জলে ধুয়ে বরফ চাপা দিয়ে তবে রক্ত বন্ধ করেছি।'

বাজীকর শুনে খুব দুঃখিত হয়ে বললে, 'আহা! বেচারার ভারি কষ্ট হয়েছে! চোখে দেখতে পায় না বলেই এই দুর্ঘটনা ঘটে গেলো!'

খোঁড়া বললে, 'যাক গে, যা হবার হয়ে গেছে। গতস্য শোচনা নাস্তি। তা তুমি এখন কোথায় চলেছো?'

বাজীকর বললে, 'কোথায় আর যাবো, বাবার কাছে ফিরে যাচ্ছি। বাবা আমার পথ চেয়ে হয়তো হা-পিত্যেশ করে রয়েছেন।'

'তোমার টাকাগুলো সাবধানে রেখেছো তো?' খোঁড়া জিজ্ঞেস করলে।

বাজীকর বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সে ঠিক আছে। কেবল দশ টাকা কমেছে চাওলাকে দিতে হলো বলে।'

'আরে, ও কিছু নয়। ওর জন্য ভেবোনা। ও আমরা পুরিয়ে দিয়ে তবে তো গিয়ে টাকার গাছ পুঁতে আসবো। ও সামান্য টাকা নিয়ে কি বাবার কাছে গিয়ে দাঁড়ানো ভালো দেখায়? চলো, জাদুদীঘির পাড়ে যাই। তোমার একশো টাকা এক লাখ হয়ে যাবে রাতারাতি।' খোঁড়া বললে।

কানা বললে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেই ভালো। চলে চলো দিনে দিনে যাই। রাতে যাওয়া অনেক বিপদ।'

বাজীকর বললে, 'না ভাই, আজ থাক। আজ আর অতদূর যেতে পারবো না। বড়ো ক্লান্ত!'

খোঁড়া বললে, 'কে বলেছে অতদূর? তুমি দেখছি পথঘাট কিছুই চেনো না। আমরা যে জাদুদীঘির পাড়ের খুব কাছেই রয়েছি। এখান থেকে আধ মাইলও নয়। একদিন পরেই বাবার কাছে যখন এক কাঁড়ি টাকা, না না টাকা নয়, এক হাঁড়ি মোহর নিয়ে গিয়ে দেবে, বাবা তোমায় কত আদর করবেন বলো তো?'

কানা বললে, 'চলো, চলো। আর দোমনা হয়ো না। এমন করে হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে নেই।'

নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ওদের পীড়াপীড়িতে বাজীকর বললে, 'তোমরা যখন এত করে বলছো, চলো তবে যাওয়াই যাক।'

আবার তিন জনে চললো তারা। চলতে চলতে বেলা প্রায় মধ্যাহ্ন পার হয়ে গেলো।

বাজীকর বললে, 'আর কতদুর?'

সঙ্গী দু'জনেই বলে উঠলো, 'এই তো এসে পড়েছি। এই যে বোকা-পাড়ার-ফাঁড়ি দেখছো; এর পরই জাদুদীঘির পাড়।'

বাজীকর চেয়ে দেখলে চারিদিকে, পথে যে-সব নেড়িকুত্তা ঘুরে বেড়াচ্ছে সবগুলোই হাড্ডি সার। পেট ভরে খেতে না-পেলে যেমন আকার হয়। কাকগুলো শুকনো গাছের ডালে বসে ঝোড়ো কাকের মতো ধুঁকছে! চারদিকে নোংরা! মাছি ভন্ ভন্ করছে। মরার মতো গোরু এক-আধটা পথের ওপর বসে ঝিমুচ্ছে। তাদের হাড়-পাঁজরা গোনা যায়। ল্যাজ নেড়ে মাছি তাড়াচ্ছে। বাজীকরের গা ঘিন্ ঘিন্ করতে লাগলো। তার কেবলই মনে হতে লাগলো এগুলো অলক্ষণ? বললে, 'চলো, তাড়াতাড়ি এগিয়ে যাই। জাদুদীঘির পাড় এখান থেকে আর কতটা তফাতে?'

'আর দু' চার পা।' খোঁড়া বললে।

কানা বললে, 'এই যে বোকাপাড়ার ফাঁড়ির পাশেই। চলোনা, একটু পা চালিয়ে।'

বাজীকর বললে, 'কোনো লোকজন তো দেখতে পাচ্ছিনে এ অঞ্চলে।'

'এখানে লোকজন পাবে কোথা? একি শহর? চলো চলো, এগিয়ে চলো। ওই যে মোহর চাষের মাঠ। এসে পড়েছি এইবার।' খোঁড়া বললে।

কানা বললে, 'একটা পরিচ্ছন্ন ভালো জায়গা দেখে তুমি একটা গর্ত খুঁড়ে ফ্যালো।'

বাজীকর বললে, 'খুঁড়বো কী দিয়ে? একটা শাবল কি কোদাল কিছু এনে দাও।'

খোঁড়া বললে, 'সর্বনাশ! শাবল কোদাল কী করবে? এমনিতে লোহা ঠেকানো চলবে না। লোহা ছোঁয়ালেই তোমার টাকা আর সোনার মোহর না হয়ে লোহার চাকতি হয়ে যাবে। হাত দিয়ে যতটুকু পারো খোঁড়ো। হাতে তো নখ রয়েছে। নখ দিয়ে মাটি আঁচড়ে তোলো না।'

বাজীকর তাদের কথা মতো অনেক কষ্টে হাতের নখ দিয়ে আঁচড়ে আঁচড়ে আঙুল দিয়ে মাটি তুলে একটা 'গাবু' মতো করলে।

খোঁড়া বললে, 'ওইতেই হবে। ছাখো নি, চাষীরা ধান বোনে কতটুকু মাটি কেটে। নাও, এইবার তোমার টাকাগুলো ওই গর্তে রেখে মাটি চাপা দাও।'

বাজীকর তাই করলে।

'এইবার জাদুদীঘির জল এনে শুকনো মাটি ভিজিয়ে দাও', খোঁড়া বললে।

'কিসে করে জল আনবো? বালতি বা ঘটি একটা কিছু দাও।' বাজীকর বললে।

কানা হেসে উঠে বললে 'তবেই হয়েছে! বালতি, ঘটি কী হবে? যাও, হাতের আঁজলা ভরে এক আঁজলা জল এনে ছিটিয়ে দাও ওই মাটির ওপর। ব্যাস! তাতেই কাজ হবে।'

বাজীকর গিয়ে জাদুদীঘি থেকে এক আঁচলা জল নিয়ে এল। খোঁড়া বললে, 'এই মন্ত্রটা পড়তে পড়তে জলটা ছিটিয়ে দাও ওখানে। বলো, "যা দেবী লক্ষ্মী-রূপেণ স্বর্ণ মুদ্রায় সংস্থিতা। নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমস্তস্যৈঃ নমো নমঃ॥"

বাজীকর মন্ত্র পড়ে জল ছিটিয়ে বললে, 'আর কী করতে হবে?'

কানা খোঁড়া এবার একসঙ্গে বলে উঠলো 'ব্যস! ব্যস! আর কিছু করতে হবে না। চলো, এইবার আমরা কুবেরকে প্রণাম করে এখান থেকে চলে যাই। কাল ভোরে উঠে মা লক্ষ্মীকে স্মরণ করে, তাঁর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে এখানে চলে আসবে। দেখবে এসে এখানে দিব্যি মোহরের চারা গজিয়েছে। আর তার ডালে-ডালে পাতায় পাতায় থান থান সোনার মোহর ফলে ঝলমল করছে!'

কানা বললে, 'আসবার সময় একটা থলে আনতে ভুলো না। নইলে অত সোনার মোহর নিয়ে যাবে কেমন করে?'

খোঁড়া বললে, 'চলো-চলো, বাড়ি চলো। আর এখানে দাঁড়িয়ো না। আর একটা কথা মনে রেখো, বাড়ি যাবার সময় পিছন ফিরে চেয়ে দেখো না। তাহলে মোহরের চারা গজাবে না।'

বাজীকর তার বাড়ির পথ ধরলো। কানা খোঁড়া উল্টো পথে চললো। ওদের বাড়ি তারা বললে উল্টো দিকে। আর বললে, 'কাল আমরাও আসবো ভাগ নিতে। মোহর পেয়ে যেন আমাদের বখশিষের কথা ভুলে যেয়ো না।'

সপ্তম দিন

পরদিন ভোর না হতেই বাজীকর ছুটলো জাদুদীঘির পাড়ের দিকে। সে কাল রাত্রে আর বাড়ি যায়নি। বাড়ি তার সেখান থেকে অনেক দূর বলে সে কাছাকাছি একটা সরাইখানা দেখতে পেয়ে রাত্রের মতো সেখানেই আশ্রয় নিয়ে শুয়েছিলো।

কিন্তু সারারাত সে ঘুমুতে পারেনি। কেবল জেগে জেগে স্বপ্ন দেখেছে—যেখানে সে টাকা পুঁতে এসেছে সেখানে বেশ ঝাঁকড়া একটি মোহরের চারা বেরিয়েছে, আর তার প্রত্যেকটি ডালে ডালে পাতায় পাতায় সোনার মোহর ফলে ঝলমল করছে। একটি একটি করে সে মোহর পেড়ে থলেয় ভরছে। খুশিতে তার মন একেবারে টই টুম্বুর। থলে ভরে তার মোহর উপচে পড়ছে। আর ধরে না। অথচ অনেক মোহর তোলা তখনও বাকি! কী করে সে? কেমন করে নিয়ে যাবে? শেষে বুদ্ধি করে কোঁচার কাপড়টা খুলে তাইতে ভরে নিয়ে যখন কোঁচড়টা গুজতে যাচ্ছে হঠাৎ সামনে দেখতে পেলে সেই কালো পোশাক ঢাকা ডাকাত দুটো সামনে দাঁড়িয়ে! তাদের সঙ্গে চোখো-চোখি হতেই তারা হাঃ হাঃ হাঃ করে বিকট আওয়াজে অট্টহাসি হেসে উঠলো।

বাজীকরের আত্মাপুরুষ খাঁচা ছাড়া। সে ভীষণ ভয়ে আঁৎকে উঠে যেই চিৎকার করতে যাবে অমনি তার ঘুম ভেঙে গেলো। সমস্ত শরীর তার ঘামে ভিজে উঠেছে। বুঝতে পারলে সে স্বপ্ন দেখছিলো, কিন্তু কী বিশ্রী দুঃস্বপ্ন।

চারদিক চেয়ে দেখলে, ঘরের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে। রাত আর নেই। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু হয়েছে। পূর্ব দিক রাঙা হয়ে উঠছে। 'দুর্গা' 'দুর্গা' বলে সে উঠে পড়লো। তাড়াতাড়ি চোখে মুখে একটু জল দিয়ে, কিছু না খেয়েই বেরিয়ে গেলো জাদুদীঘির মাঠের দিকে।

মনে তার কত আশা—কত কল্পনা—কত আশঙ্কা! ভাবছে সে,—যদি লাখ টাকা না পেয়ে দশ-বিশ হাজারও পাই তাহলেও আমার আর আমার বাবার দুঃখ ঘুচে যাবে। সারাজীবন আমরা বেশ সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকবো। আমার যত কিছু শখ সাধ আছে প্রাণ ভ'রে সব মিটিয়ে নেবো। প্রথমেই

তো বাবার ওই কুঁড়ে ঘর ভেঙে একখানা রাজপ্রাসাদের মতো চমৎকার বাড়ি করবো। আমার অশ্বশালায় ভালো ভালো পঞ্চকল্যাণ ঘোড়া থাকবে। গাড়ি কিনবো, একখানা বাবার একখানা আমার। রোজ আমরা মাছ, মাংস পোলাও, কালিয়া, দই, ক্ষীর, পায়েস, সন্দেশ, রসগোল্লা খাবো। ডাল রুটি কি ছাতু আর মুখেও দিচ্ছিনি কেউ। আমাদের ভাঁড়ারে থাকবে জারে ভরা ঘি, মধু মিছরি আর বাতাসা, পাটালি গুড়, চিনির মুড়কি, গুজির মেঠাই, কালাকাঁদ বরফি, সরের নাড়ু, পেস্তা বাদামের তক্তি। যখন যেটা খুশি নিয়ে খাবো। বাবাকে একটা জরির টুপি কিনে দেবো। আমি একটা পালক দেয়া মখমলের টুপি পরবো। মাথায় দিলে মনে হবে আমি যেন কোনো দেশের রাজা! কেউ আমাকে আর কাঠের পুতুল বলে চিনতেই পারবে না। হ্যাঁ, সেই পুতুল-নাচওলা কর্তাকে আমি অনেক টাকা দেবো। কারণ তিনিই আমার সৌভাগ্যের মূল। আর আমার সেই কানা খোঁড়া বন্ধু দুটিকে এমন কিছু দেবো যাতে তারা খুশি হয়ে যাবে—

এমনি কত কি আকাশকুসুম মনের নিভৃত কুঞ্জবনে ফোটাতে ফোটাতে বাজীকর এসে পড়লো সেই জাদুদীঘির পাড়ে। বুক তার উত্তেজনায় টিপটিপ করছে। দূর থেকেই পায়ের ওপর ডিঙি মেরে উঁচু হয়ে হয়ে দেখবার চেষ্টা করলে দূর থেকেই মোহর গাছটি তার নজরে পড়ে কিনা। কিন্তু কিছুই দেখতে পেলে না। ভীষণ উৎসাহে সে এগিয়ে চললো। ভাবলে চারা গাছ তো বেশি বড়ো হয় না, তা ছাড়া মোহরের ভারে হয়তো নুয়ে পড়ছে। আরও একটু এগিয়ে গিয়ে আর একবার ডিঙি মেরে দেখবার চেষ্টা করলে, দেখা গেলোনা কিছু। তখন সে জোরে পা চালিয়ে একেবারে জাদুদীঘির পাড়ের মাঠে এসে পড়লো।

মাঠের চারদিকে, চোখ বুলিয়ে দেখলে বাজীকর; কোথাও একটা ঘাসের শিষ পর্যন্ত চোখে পড়ছে না। সে এবার রীতিমতো উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠলো। দ্রুত পা চালিয়ে কাল মাঠের যেখানে খুঁড়ে সে টাকা পুঁতে মাটি চাপা দিয়ে এসেছিলো খুঁজে খুঁজে সেখানে গিয়ে হাজির হলো। দেখলে সদ্য খোঁড়া মাটি তেমনিই চাপা দেয়া রয়েছে। জল ছিটিয়ে দেয়ার দাগগুলোও এখনো মাটির বুকে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু মোহরের চারা কই? একটা কলা পর্যন্ত বেরোয়নি সেখানে।

বাজীকরের মুখটি শুকিয়ে উঠলো। সে ভাবলে হয়তো রূপোর টাকা

না পুঁতে নোট পুঁতেছে বলে চারা উঠতে দেরি হচ্ছে। সম্ভবতঃ আজ রাত্রেই কলা বেরুবে। কাল সকাল নাগাদ মোহরের চারা দেখা যাবে। দু'দিন না হয় অপেক্ষা করে থাকা যাক। আজ ফিরে যাই। কাল সকালে আবার এসে দেখবো চারা গজিয়েছে কিনা!

এই ভেবে মাথা চুলকুতে চুলকুতে সে যখন সরাইখানার দিকে ফিরছে এমন সময় একটা টিয়াপাখি তার মাথার ওপর দিয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ করে ডাকতে ডাকতে উড়ে গেলো। হঠাৎ তার মনে পড়লো টাকা পুঁতে কাল ভালো করে জল দেয়া হয়নি। কলা না বেরুবার সেও একটা কারণ হতে পারে। তখন সে আবার ফিরে জাদুদীঘি থেকে আঁজলা আঁজলা জল এনে সেই টাকা-পোঁতা মাটির ওপর ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিলে। তারপর চিন্তিত মুখে ধীরে ধীরে পা পা করে যখন সরাইখানার দিকে ফিরছে, একটা পাগলী তাকে দেখে হাহা করে হেসে উঠলো!

এ হাসিটা বাজীকরের একটুও ভালো লাগলো না। তার কানে সেটা যেন উপহাসের মতো শোনালো। সে ভীষণ রেগে উঠে পাগলীকে এক ধমক দিয়ে বললে, 'তুই তো ভারি অসভ্য! অমন করে অট্টহাসি হাসছিস কেন? হাসবার মতো তো কিছু ঘটেনি এখানে!'

পাগলী তার কথা শুনে আবার অট্টহাসি হেসে উঠলো। হাসতে হাসতেই বললে, 'মানুষ যদি গাধার চেয়েও বোকার মতো কাজ করে তাহলে না হেসে কি থাকা যায়? জোচ্চোরদের মিথ্যে ধাপ্পাবাজিতে ভুলে যে-লোক পয়লা নম্বর হাঁদার মতো কাজ করে তার দুর্দশা দেখে কার না হাসি পায়?'

বাজীকর পাগলীর কথাগুলো ঠিক ধরতে পারলে না। জিজ্ঞেস করলে, 'তুমি কি আমার সম্বন্ধে ওই কথাগুলো বলছো?'

পাগলী বললে, 'তুমি ছাড়া এই জনমানবশূন্য মাঠে এমন সাত সকালে আর কে এসেছে বলো যে তাকে দেখে হাসবো? তুমি! তুমি! হ্যাঁ, তোমারই বোকার মতো কাণ্ডকারখানা দেখে আমি হাসি চেপে রাখতে পারছি নে! ছি ছি ছি! তুমি এত নির্বোধ? তোমার এ জ্ঞান নেই যে টাকা মাটিতে পুঁতলে গাছ হয় না। টাকা তো কোনো ফলমূলের বীজ নয়, যে মাটিতে বুনে দিয়ে জল ঢাললেই চারাগাছ গজাবে আর ফলফুলে ভরে ভরে উঠবে। তরি-তরকারির বীজ হলেও বা গাছ বেরুতো! কিন্তু টাকা, তা সে রূপোরই হোক সোনারই হোক আর কাগজেরই হোক, তা থেকে কি চারা বেরুতে পারে

মাটিতে পুঁতলে? ওরে হতভাগা ছেলে! আমিও যে একবার জোচ্চোরের কথা শুনে তোর মতো বোকামি করে গয়নার গাছ হবে বিশ্বাস করে আমার গায়ের সমস্ত গহনা মাটিতে পুঁতেছিলুম, কিন্তু যখন বুঝতে পারলুম আমি জোচ্চোরের পাল্লায় পড়ে ঠকেছি তখন আর কোনো উপায় নেই। অনেক দেরী হয়ে গেছে। ধরবো কাকে, ভেবে ভেবে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেলো। এখন আমি বুঝেছি টাকা-পয়সাই বলো আর গয়নাগাটিই বলো, এ সব বাড়াতে হলে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার করতে হবে, আর হিসেব মতো খরচ করে কিছু কিছু সঞ্চয় করতে হবে। সুতরাং প্রথমে শেখা দরকার সৎ পথে থেকে সৎভাবে অর্থ উপার্জন করা যায় কী উপায়ে? পরিশ্রমে যে পরাঙ্মুখ তার দারিদ্র্য কোনোকালেই ঘোচে না। উপার্জন করতে হবে, নিজের হাত মাথা আর শুভবুদ্ধি কাজে খাটানো দরকার।'

বাজীকর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বললে, 'আমি তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি নে। এসব কথা কি আমাকে বলছো তুমি?'

পাগলী শুনে আবার হো হো করে হেসে উঠলো। তার হাসির শব্দে বাজীকরের বুক ভয়ে কেঁপে উঠলো। তার হঠাৎ মনে হলো তবে কি আমিও ঠকেছি?

পাগলী বললে, 'আহা। তুমি অত চটছো কেন ছোকরা? ধৈর্য ধরো, ধৈর্য ধরো। শোনো, আমি তোমায় সব বুঝিয়ে বলছি। তুমি যেমনি ছেলে-মানুষ, তেমনি একটা মূর্খ আর গাধার চেয়েও বোকা। আমি আগাগোড়া তোমার সব কাণ্ডকারখানাই আড়াল থেকে দেখেছি। শোনো বলি, ওই যে তোমার দুটি বিশ্বস্ত বন্ধু কানা আর খোঁড়া—ওরা কানাও নয় আর খোঁড়াও নয়। ওরা কানা-খোঁড়া সেজে লোক ঠকাবার জন্যে ঘুরে বেড়ায়। ওরা কথায় কথায় যেই তোমার মুখ থেকে শুনলে যে তোমার কাছে টাকা আছে—একশো টাকা নগদ রয়েছে, তখন থেকেই ওরা ফিকির আঁটছে কেমন করে তোমার টাকাটা হাত করতে পারে। তোমাকে ওরা ভুলিয়ে ভুলিয়ে টাকা থেকে মোহরের গাছ করে দেবে বলে জাদুদীঘির মাঠ বলে অনেক দূরে একটা ভুল পথে নিয়ে গিয়েছিলো; তারপর অন্ধকারে তোমাকে ছেড়ে দিয়ে, ওরা সরে গিয়ে কালো পোশাক পরে এসেছিলো, ভয় দেখিয়ে ডাকাতি করে তোমার টাকাগুলো কেড়ে নিতে। কিন্তু তুমি শক্ত ছেলে। বোকা বটে কিন্তু সাহস আছে। ভাগ্যিস ওই কানাটার কান কামড়ে ছিঁড়ে দিয়ে

পালিয়েছিলে তাই বেঁচে গেছলে! কিন্তু এমন নির্বোধ তুমি, আবার তার পর দিন ওদের পাল্লায় পড়লে। চা-ওলার দোকানের কাণ্ড দেখে তোমার বোঝা উচিত ছিলো যে ওরা ভালো লোক নয়, 'খিদে নেই, আমি কিছু খাবো না' বলে যে ন'খানা মটন চপ আর সাতখানা ফাউল কাটলেট খেয়ে ফ্যালে, তুমি বোকা বুঝতে পারলে না যে তারা দুর্ভিক্ষের আসামী। তোমার পয়সায় পেট ভরে সাধ মিটিয়ে খেয়ে নিলে। তোমাকে পরের দিন আবার ভালোমানুষ সেজে ভুলিয়ে বোকা বানিয়ে নিয়ে এলো এই জাদুদীঘির পাড়ে। তোমাকে দিয়ে টাকাগুলো মাটিতে পুঁতিয়ে তোমায় বাড়ি পাঠিয়ে দিলে। তুমি চলে যাবার পর সেই কানা-খোঁড়া আবার এখানে এসে মাটির ভিতরে থেকে তোমার পোঁতা টাকাগুলি বার করে নিয়ে সরে পড়েছে। তুমি যতই জল ঢালো ওখানে মোহরের চারা দেখা তোমার স্বপ্নই হয়ে থাকবে। সে জোচ্চোরদের ধরা তোমার মতো বোকা ছেলের কাজ নয়।'

বাজীকর এত বড়ো ঠগ-জোচ্চোরদের হতে পড়েছিলো সে কথা যেন বিশ্বাস করতে পারছিলো না। ছুটে গিয়ে সে দু'হাতে আঁচড়ে আঁচড়ে সব মাটি খুঁড়ে ফেলে দেখলে গর্ত খালি। একখানা নোটও সেখানে নেই। একেবারে শূন্য।

বাজীকর এবার হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলো।

তার কান্না দেখে পাগলী হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলো। বললে, 'কাঠের পুতুল! তুমি বেটাছেলে, তোমার উপার্জনের মাত্র একশো টাকা গেছে বলে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছো! আর আমার কথা একবার ভেবে ভাখো, যথাসর্বস্ব ছিলো ওই গহনা। সে আমি নিজের বুদ্ধির দোষেই হারিয়েছি। নিজের বোকামির জন্যই খুইয়েছি। তাই আমি আর দুঃখ করি না। আমি হাসি!'

বাজীকর বললে, 'আমি ছাড়বো না। আমি ওদের নামে পুলিশে নালিশ করবো!'

পাগলী আবার হো হো করে হেসে উঠলো। বললে, 'নালিশ করবে? কার নামে? ওদের নাম ঠিকানা জানো তুমি?'

'না।' মাথা হেঁট করে বললে বাজীকর।

'তবে?' পাগলী বললে, 'থানায় গেলে তোমাকেই তারা হাজতে পুরে রাখবে। তারপর পাগলা গারদে চালান করে দেবে। কারণ টাকার গাছ পুঁততে—মোহরের চারার চাষ করতে যারা যায় তারা কেউ সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষ

নয়। শুধু বোকা নয়, তারা পাগল। যেমন ধরো না এই আমি। মাটিতে গয়না পুঁতে গয়নার গাছে দেদার গয়না পাবো ভেবেছিলুম।'

বাজীকর একটু চুপ করে থেকে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললে, 'তাহলে আমি এখন কি করবো?'

পাগলী বললে, 'তোমার ভাবনা কি? তুমি গুণী ছেলে। ফিরে যাও তোমার সেই পুতুল-নাচের কর্তার কাছে। তাঁকে সব কথা অপকটে গিয়ে বলো। তিনি তোমার উপর খুশি আছেন। তুমি গেলেই সেখানে কাজ পাবে। খেটে পরিশ্রম করে নিজের গুণে যা উপার্জন করবে সেই হবে তোমার সোনার মোহর। কাঠের পুতুল বাজীকরের খেলার সুনাম দেশময় ছড়িয়ে পড়বে। যা উপার্জন করবে তার অর্ধেক তোমার বাবাকে পাঠাবে। তাঁর আশীর্বাদে তুমি দেশের অদ্বিতীয় কাঠের পুতুল হয়ে উঠবে।'

বাজীকর পাগলীর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'আমার মা নেই। আজ থেকে তুমি আমার মা। আমি উপার্জন করে তোমার সব গহনা গড়িয়ে দেবো।'

পাগলী আবার হো হো করে হেসে উঠলো।

নাটক
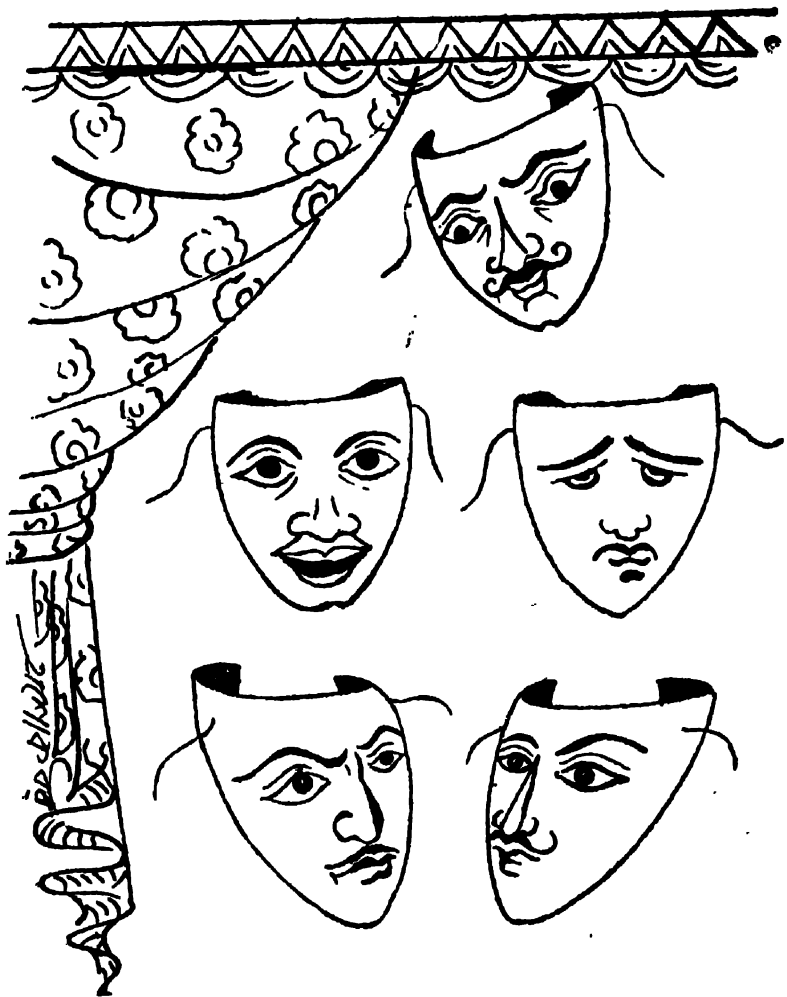
যুবরাজ

—যাঁরা আছেন এই নাটিকায়—

মুরলা ... ... একটি গরীব গৃহস্থের মেয়ে।

জ্যোতির্ময়ী ... ... মুরলার বিধবা মা।

ফুল্লরা ... ... মুরলার প্রতিবাসিনী বন্ধু।

যুবরাজ ইন্দ্রজিত .. দেশের রাজপুত্র।

মল্লিনাথ ... ... সেনাপতি ও ইন্দ্রজিতের বন্ধু।

যুবরাজের দেহরক্ষীগণ, সৈন্যগণ, পাইক বরকন্দাজ ইত্যাদি।

স্থান : নগর প্রান্তে গৃহস্থপল্লীর একখানি ছোট্ট একতলা বাড়ীর ঘর।

সময় : সবেমাত্র ভোরের সূর্য উঠে পূবের আকাশ রাঙা করে তুলেছে।

[সকালের সেই মৃদু আলোয় ঘরের ভিতরটি দেখা যাচ্ছে। আসবাব কিছুই নেই। শুধু একপাশে একখানি তক্তাপোষ। তলায় ছোট একটি রঙীন টিনের বাক্স। পাশে জলচৌকির ওপর সামান্য ক'খানি ঝকঝকে মাজা কাঁসা পিতলের বাসন। এককোণে দড়ির আলনায় দু'চারখানি ধোয়া শাড়ী ঝুলছে। দেওয়ালের গায়ে হর-পার্বতীর সুন্দর একখানি ছবি টাঙানো। সামনের দালানে মাটির টবে একটি ঝাঁকড়া তুলসীগাছ। একটি ময়না পাখীর খাঁচা ঝুলছে। ঘরের ভিতর সেই তক্তাপোষের ওপর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানায় একটি পরমাসুন্দরী তরুণী মেয়ে শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে—'দুঃসাহসী যুবরাজ।' মেয়েটির শিয়রে দক্ষিণ দিকে একটি ছোট্ট জানালা। খোলা জানালা দিয়ে সকালের এক ফালি সোনালী রোদ মেয়েটির বিছানায় এসে পড়েছে। প্রাতঃস্নান ও পূজা-আহ্নিক সেরে জ্যোতির্ময়ী ঘরে ঢুকলেন।]

জ্যোতির্ময়ী : (মেয়েটির দিকে সস্নেহ দৃষ্টিতে :) আমি তাহলে আসি মা ?

মুরলা: (চমকে উঠে) একি! তুমি এখনো কাজে যাওনি মা? রোদ উঠে গেল যে!

জ্যোতির্ময়ী: আজ কাজে যাবার তাড়া নেই। ওরা সপরিবারে যুবরাজকে দেখতে বেরিয়েছেন। তিনি আমাদের এই পথ দিয়েই যাবেন নগর প্রান্তে নতুন ভবানী মন্দিরের দ্বার খুলতে।

মুরলা: (উত্তেজিত হয়ে বিছানায় উঠে বসে) হ্যাঁ মা! সত্যি যুবরাজ যাবেন আমাদের এই পথ দিয়ে? ও মা, আমি যাব দেখতে।

জ্যোতির্ময়ী: বেশ তো, ওই জানালার ধারে মোড়া পেতে তোমায় বসিয়ে দিয়ে যাচ্ছি। ওইখান থেকে তুমি সব দেখতে পাবে।

মুরলা: (ব্যাকুল ভাবে) দাও মা, আমায় জানালার ধারে বসিয়ে দাও। আমি দেখবো যুবরাজকে। তিনি কি সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বাজনা-বাদ্যির সঙ্গে মিছিল করে যাবেন? হ্যাঁ মা! হাতীর পিঠে হাওদা দিয়ে না ঘোড়ার পিঠে জিন্ দিয়ে যাবেন?

জ্যোতির্ময়ী: (মেয়েকে তুলে জানালায় নিয়ে যেতে যেতে) সে তো আমি ঠিক জানিনে মা। শুনেছি যুবরাজ বড় খামখেয়ালী। তিনি নাকি আজ রথে চড়ে আসবেন।

মুরলা: তাই বোধ হয় ফুল্লরা আজ আমার সঙ্গে পুতুল খেলতে আসেনি। নিশ্চয় যুবরাজকে দেখতে গেছে। আমি যে হাঁটতে পারিনে; নইলে আমিও যেতুম। যুবরাজকে খুব কাছে গিয়ে দেখতুম!

জ্যোতির্ময়ী: তুমি এখান থেকে সব দেখতে পাবে। কিচ্ছু ভেব না। আসি। বেলা হ'ল।

মুরলা: আচ্ছা। কিন্তু মা, তুমি যুবরাজকে না দেখে ফিরো না। আমি যদি জানালা দিয়ে ভাল দেখতে না পাই, তোমার মুখে গল্প শুনবো।

জ্যোতির্ময়ী: আচ্ছা। সেই বেশ। আর আমি যদি যুবরাজকে দেখতে না পাই, বাড়ী এসে তোমার মুখে গল্প শুনবো। (প্রস্থানোদ্যত)

মুরলা: মা! মা! শোনো—অই যাঃ, পিছু ডেকে ফেললুম! দুর্গা! দুর্গা! মা! দেখ, তোমার যদি ফুল্লরার সঙ্গে দেখা হয় আমার কাছে আসতে বোলো। যুবরাজকে কেমন সে দেখলে, তার কাছেও শুনবো—

জ্যোতির্ময়ী : আচ্ছা বলবো। এইবার তবে আসি। (মেয়েকে আদর করে প্রস্থান)

মুরলা : (আপন মনে) যুবরাজ! (জানালার দিকে চেয়ে) না জানি কেমন দেখতে! নাম শুনেছি 'দিব্যেন্দু কুমার।' সুন্দর নামটি। কখনো চোখে দেখিনি। না জানি তিনি কেমন? রাজার ছেলে —নিশ্চয় খুব সুপুরুষ। আমার ভারি দেখবার ইচ্ছে—

(বাইরে বহু কণ্ঠে জনতার কোলাহল শোনা গেল। মুরলা আগ্রহে জানালা দিয়ে মুখ বাড়ালে। কানে এল বাজনা তুরি, ভেরী, ঢাক, ঢোল ও বাঁশী। সঙ্গে সঙ্গে কাঁসর ঘণ্টা ঝাঁঝ আর ঘন ঘন শঙ্খনাদও শোনা যাচ্ছে। অসংখ্য উল্লসিত কণ্ঠে আওয়াজ উঠলো—"জয় যুবরাজের জয়!"

মুরলাও মনে মনে জনতার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলে উঠলো— "জয় যুবরাজের জয়!" দেখতে পেল বিরাট মিছিল দীর্ঘ পথ জুড়ে চলেছে। অজস্র মানুষের মাথা। একবার যেন একটা রথের চূড়ো মুরলার চোখে পড়লো। আর দেখতে পেল না। আড়াল পড়ে গেল। দীর্ঘ মিছিল শেষ হয়ে গেল। বাজনা-বাদ্যি জনকোলাহল সব মিলিয়ে এল। মুরলা যুবরাজকে দেখতে পেল না। শেষে হতাশ হয়ে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জানালাটা জোরে বন্ধ করে দিয়ে দেওয়াল ধরে টলমল করতে করতে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ল। দুই চোখ জলে ভরা।

কতক্ষণ যে কেঁদে কেঁদে ঘুমিয়ে পড়েছে মনে নেই। হঠাৎ যেন কার দরজা খোলার শব্দ পেয়ে ঘুম ভেঙে চমকে উঠে জিজ্ঞাসা করলে—)

মুরলা : কে গো? মা ফিরে এলে বুঝি?

(একটি সুসজ্জিত সুন্দর প্রিয়দর্শন তরুণ এসে ঢুকলো)

যুবক : (বিনীত অভিবাদন জানিয়ে) নমস্কার! খবর না দিয়ে এসেছি। ক্ষমা চাই।

মুরলা : (অবাক হয়ে মুখের দিকে চেয়ে) নমস্কার! তুমি কে? চিনতে পারছিনে তো। মাকে খুঁজছো? তিনি বাড়ী নেই। এখনি ফিরবেন। তুমি ওই জানালার ধারে মোড়াখানা টেনে নিয়ে একটু বোস। কিছু মনে কর না। আমার পায়ে জোর নেই।

নইলে, নিজে উঠে গিয়ে অতিথিকে বসবার জন্যে আসন এনে দিতুম।

যুবক : (মোড়া টেনে এনে বিছানার কাছে বসে) শূন্য ঘরে সারাদিন একলাটি চুপ করে শুয়ে থাকেন বুঝি আপনি? আপনার ভয় করে না?

মুরলা : 'আপনি' বলছো কেন? আমাকে কেউ ত' বলে না! 'তুমি' বলো। দেখছো না আমিও 'তুমি' বলছি। একলা থাকবো কেন? আমার মা থাকেন কাছে। শুধু সকাল বিকেল একটু জমিদার-বাড়ীতে কাজ করতে যান। তাছাড়া আমার বন্ধু ফুল্লরা আছে। সে প্রায়ই আসে আমার সঙ্গে পুতুল খেলতে। আজ সে যুবরাজকে দেখতে গেছে। তাই আসেনি। আমি তার কাছে শুনবো যুবরাজকে কেমন দেখলে?

যুবক : যুবরাজের কথা শুনতে তোমার এত আগ্রহ কেন?

মুরলা : বারে! আমি যুবরাজকে খুব ভালবাসি। ভক্তি করি। জানো কি আমি আজ সারা সকালটি কাটিয়েছি ওই জানালার ধারে বসে। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্য, যুবরাজের দেখা পেলুম না। মনে খুব কষ্ট হচ্ছে।

যুবক : যুবরাজ তো তাহলে তোমাকে শুধু হতাশ করেনি মনে কষ্টও দিয়েছে।

মুরলা : না না! যুবরাজের কি দোষ? তিনি তো গেলেন আমাদের ওই পথ দিয়েই। কিন্তু জানালাটা বড় ছোট। ভিড়ের আড়ালে তাঁকে দেখা গেল না।

যুবক : কই, তোমার মা তো এখনও ফিরলেন না? অনেক বেলা হয়ে গেল।

মুরলা : এখনি আসবেন। তুমি বুঝি আমার মাকে চেন?

যুবক : না, তাঁকে আমি কখনো দেখিনি। এই পথ দিয়ে যাবার সময় জানালার ধারে তোমার সুন্দর মুখখানি দেখতে পেলুম। খুব ভাল লাগলো। তুমি এমন ব্যগ্র ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে পথের পানে চেয়েছিলে, দেখে বড় কৌতূহল হল। ভাবলুম, যাই জেনে আসি ওই প্রতিমার মতো মেয়েটি এত আগ্রহে কী দেখছে? কাকে খুঁজছে ওর বড় বড় চোখ দুটি? ঢুকে পড়লুম 'দুঃসাহসী যুবরাজের'

মতো একেবারে তোমাদের এই ঘরে। আমি এসেছি বলে তুমি কি আমার ওপর খুব বিরক্ত হয়েছো?

মুরলা : (ব্যস্ত হয়ে) না না। একটুও না, বিরক্ত হবো কেন? বরং তুমি আসতে আমার মনটা খুসী হয়ে উঠেছে। আমার কাছে তো কেউ আসে না। আমি চলতে পারি না, হাঁটতে পারি না। তাছাড়া আমরা খুব গরীব কিনা। গরীবের সঙ্গে কেউ মিশতে চায় না। অথচ মার মুখে শুনেছি আমরা নাকি একদিন বেশ বড়লোক ছিলুম। আমার দাদুর হাতী ঘোড়া রথ সব ছিল। রাজপ্রাসাদের মতো বাড়ী ছিল। ফুল্লরাও শুনেছে এসব কথা তার পিসিমার কাছে।

যুবক : তোমার সেই বড়লোক বন্ধু ফুল্লরা?

মুরলা। হ্যাঁ। ওর বাপ মা নেই। পিসিমার কাছেই মানুষ হয়েছে। ওর পিসিমা কিন্তু খুব বড়লোক। ও পাঠশালায় যায়, পড়াশোনা করে। আমি হাঁটতে চলতে পারিনে, তাই মার কাছেই লেখাপড়া শিখি। মা বলেন, আমি নাকি ফুল্লরার চেয়ে পড়াশোনায় অনেক এগিয়ে আছি। কিন্তু মা যাই বলুন, বইখাতা নিয়ে আমার পাঠশালায় যেতে খুব ইচ্ছে করে। কিন্তু উপায় তো নেই। পা চলে না।

যুবক : তোমার পায়ের চিকিৎসা করানো হয়েছিল?

মুরলা : যতরকম চিকিৎসা হতে পারে মা কিছু বাকি রাখেন নি। আমার বরাত মন্দ। সারলো না। বদ্যিরা বলেছেন সমুদ্রের ধারে কিছুদিন নোনা জলের কাছে থাকলে আমার পা ভাল হয়ে যাবে। তাই তো না খেয়ে মা টাকা জমাচ্ছেন, আমাকে সাগর দ্বীপে নিয়ে যাবেন বলে।

যুবক : তুমি সারাদিন কি করে সময় কাটাও? শুয়ে থাকতে কষ্ট হয় না?

মুরলা : ও আমার অভ্যাস হয়ে গেছে। শুয়ে শুয়ে মজার মজার সব বই পড়ি। এই দেখ না, তুমি আসবার আগে 'দুঃসাহসী যুবরাজ' পড়ছিলুম। ইনি কে জানো? আমাদেরই দেশের রাজপুত্র, যাকে সবাই যুবরাজ বলে। আচ্ছা তুমি যে কে, তাতো আমায় বললে না?

যুবক : বলছি। কিন্তু তোমাকে দেখে আমার কি মনে হচ্ছে জানো? তুমি যেন সেই রূপকথার 'কুঁচ বরণ কন্যা যার মেঘবরণ চুল!'

মুরলা : তুমি কিছু জানো না। ফুল্লরার চুল আমার চেয়ে তিন আঙুল বড়।

যুবক : কে যেন আসছেন তোমার কাছে। আমি দরজা খোলার শব্দ পেলাম।

মুরলা : বোধ হয় আমার মা ফিরে এলেন।

[জ্যোতির্ময়ীর প্রবেশ]

জ্যোতির্ময়ী : মুরলা-মা, যুবরাজকে কেমন দেখলে বল? খুব সুপুরুষ না? আমার যদি ওই রকম একটি জামাই হয় তাহলে বেশ হয়।

মুরলা : সে কথা পরে হবে। এখন এই দিকে দেখ। এই ছেলেটি অনেকক্ষণ এসে বসে আছে। আমি কিন্তু পরিচয় জানি না। তুমি আলাপ করো।

(ছেলেটি উঠে জ্যোতির্ময়ীকে প্রণাম করলো)

জ্যোতির্ময়ী : (অনেকক্ষণ মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে বিস্ময়ে চমকে উঠে) আপনি! আপনি! না না, একি আমি স্বপ্ন দেখছি? এ যে যুবরাজ ইন্দ্রজিৎ! দীনের কুটিরে পদার্পণ করেছেন মহামান্য যুবরাজ?

মুরলা : (উত্তেজিত হয়ে বিছানায় উঠে বসে) ও মা! মা! এ তুমি কি বলছো মা? ইনিই কি আমাদের সেই যুবরাজ, যাঁকে দেখবার জন্যে সারা সকাল জানালার ধারে হাপিত্যেস করে কাটিয়েছি? তুমি কি সত্যিই আমার সেই দুঃসাহসী যুবরাজ? তুমি আমার মনের কথা টের পেয়েছিলে, না? মা বলেন বটে, যদি একমনে একপ্রাণে ভগবানকে কেউ ডাকে তাহলে নাকি ভগবানও এসে দেখা দেন। তোমাকে আমি সেই রকম ঐকান্তিক মনে দেখতে চেয়েছিলুম। তাই বুঝি আমায় দেখা দিতে এলে? তোমার খুব দয়া। তোমাকে আমার ভারি ভাল লাগছে।

জ্যোতির্ময়ী : অবোধ মেয়ের অপরাধ নেবেন না, যুবরাজ। ও বড় ছেলেমানুষ কাকে কি বলতে হয় জানে না। বাইরের জগতের সঙ্গে তো মেশবার সুযোগ পায়নি কখনো—একটু বসুন যুবরাজ। আমি এখনি আসছি—

(জ্যোতির্ময়ীর প্রস্থান)

যুবরাজ : আপনার মেয়েটি পূজার পুষ্পের মতো পবিত্র। এ মেয়ে রাণী হবার যোগ্য।

মুরলা : হ্যাঁ, খোঁড়া রাণী! 'শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর।'

যুবরাজ : রাণীকে তো হাঁটতে হয় না। হলেই বা খোঁড়া। তিনি তো মহাপায়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ান আরামে। সঙ্গে থাকে কত দাস দাসী সখীর দল। হ্যাঁ, ভাল কথা। তুমি যে বলেছিলে আমার রথের চূড়ায় হংসমিথুন আঁকা ধ্বজ পতাকা উড়ছে দেখেছ, তুমি কি জানো কত রাজার কতরকম ধ্বজ পতাকা আছে?

মুরলা : নিশ্চয় জানি। কপিধ্বজ, গরুড়ধ্বজ, মীনধ্বজ, মকরধ্বজ, বজ্রধ্বজ···

যুবরাজ : থাক থাক, আর বলতে হবে না। বুঝেছি তুমি বিদুষী মেয়ে—তুমি রামায়ণ পড়েছ? আচ্ছা, বন্দিনী সীতার কথা মনে পড়ে। তুমি যেন ঠিক তাঁরই মতো এই ঘরের চার দেয়ালে বন্দিনী হয়ে আছো। আমি তোমাকে উদ্ধার করবো।

মুরলা : যেমন হনুমান লঙ্কায় আগুন দিয়ে সীতাকে উদ্ধার করেছিল?

যুবরাজ : না, যেমন রঘুপতি রামচন্দ্র সীতাকে উদ্ধার করে পুনরায় অযোধ্যায় নিয়ে গিয়েছিলেন।

মুরলা : সত্যি বলছো? কিন্তু আমার মা?

(ঝড়ের মতো ফুল্লরার প্রবেশ)

ফুল্লরা : বেয়ান! শোন্ শোন্! তোর যুবরাজকে দেখে এলুম! ইন্দ্রজিৎ তো ইন্দ্রজিৎ! কী যে সুন্দর দেখতে কি আর বলবো। তোকে দেখাতে পারলুম না এই যা দুঃখ। তাই ছুটে এলুম বলতে। মন্দিরে আমি তোর জন্যে মানৎ করে মা ভবানীর পুজো দিয়ে প্রসাদ এনেছি ভাই। শিগ্গীর মা ভবানীকে প্রণাম করে প্রসাদটুকু খেয়ে ফেল, তোর পা ভাল হয়ে যাবে। (মুরলাকে প্রসাদ দিলে।) মা ভবানী বড় জাগ্রত দেবী। যে যা মানৎ করে পুজো দেয়, সঙ্গে সঙ্গে হাতে হাতে ফল পায়। তোর পা এবার নিশ্চয় ভাল হয়ে যাবে!

মুরলা : (প্রসাদ খেয়ে) জয় মা ভবানী! (দেবীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে) আমার পা দুটি ভাল করে দাও মা!

ফুল্লরা : (যুবরাজকে দেখতে পেয়ে) এ ছেলেটি কে ভাই?

মুরলা : (হেসে উঠে) ও মা! চিনতে পারলি না বুঝি? যাকে দেখবার

জন্য কাতারে কাতারে লোক আজ পথে বেরিয়ে পড়েছিল ইনিই ত আমাদের সকলের প্রিয় সেই যুবরাজ।

ফুল্লরা : ধ্যেৎ! কী যে বলিস? ও যদি যুবরাজ হবে তবে ওর দেহরক্ষীরা কই? সৈন্য সামন্ত কই? লোক-লস্কর পাইক-বরকন্দাজরা কোথায়?

যুবরাজ : দেখতে চাও তুমি তাদের ফুল্লরা?

(তুর্যধ্বনি করলেন। সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড়িয়ে ঘরের ভিতর এসে ঢুকলো সেনাপতি মল্লিনাথ, পিছু পিছু এল দেহরক্ষী ও সৈন্য-সামন্তের দল)

মুরলা : এ কি! এ যে অনেক লোক এসে ঢুকে পড়লো!

যুবরাজ : কেন, তোমার বন্ধু ফুল্লরা যে ওদের দেখতে চাইলে (এবার ফুল্লরার দিকে ফিরে) কেমন? এইবার বিশ্বাস হচ্ছে ত?

ফুল্লরা : তাইতো! এবার চিনতে পারছি! আর ওইটি বুঝি সেনাপতি।

যুবরাজ : হ্যাঁ, আমার প্রিয় বন্ধু সেনাপতি মল্লিনাথ!

ফুল্লরা : বুঝেছি। আমার বন্ধুকে কি তোমরা ধরে নিয়ে যেতে এসেছো?

মল্লিনাথ : তোমাকেও আমরা ধরে নিয়ে যাবো! নইলে উনি কার সঙ্গে খেলা করবেন?

মুরলা : (হেসে উঠে) কেমন জব্দ!

(জ্যোতির্ময়ীর প্রবেশ, হাতে এক থালা মিষ্টান্ন)

জ্যোতির্ময়ী : ওমা! এ যে অনেক লোক এসে পড়েছে। সবার তো কুলবে না।

যুবরাজ : ওতেই হবে মা! শুনেছি বিদুরের খুদ-কুড়োয় ভগবানও তুষ্ট ছিল। আমরা তো সামান্য মানুষ! কিন্তু এর চেয়েও মিষ্টি আপনার এই কন্যাটিকে আমি ভিক্ষা চাই মা!

মল্লিনাথ : যুবরাজের সঙ্গে আপনার কন্যার বিবাহ দিতে আশা করি আপনার অমত হবে না?

জ্যোতির্ময়ী : এ যে আমার আশাতীত সৌভাগ্য বাবা! কিন্তু আমার মেয়ে…

যুবরাজ : জানি, চলতে পারে না। কিন্তু হাঁটবার তো ওর কোনও প্রয়োজন হবে না।

মল্লিনাথ। আর ওঁর বন্ধু এই ফুল্লরা দেবীকেও আমরা নিয়ে যাবো—

যুবরাজ : হ্যাঁ মা। আমার বন্ধু সেনাপতি মল্লিনাথ ওকে বিবাহ করতে চায়—

জ্যোতির্ময়ী : এ তো খুব ভাল কথা বাবা, কিন্তু ওর পিসিমাকে—

মল্লিনাথ : তিনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন। আপনাকেও কিন্তু যেতে হবে মা ?

যুবরাজ : আপনাদের নিয়ে যাবার সমস্ত ব্যবস্থাই আমরা করে এসেছি মা। আমরা জেনেছি আপনি কাঞ্চিপুরের রাজকন্যা। শত্রুরা আপনার রাজ্য কেড়ে নিয়ে আপনাকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত করেছে।

মল্লিনাথ : আর ফুল্লরা যে বৃদ্ধ সেনাপতি রণবীর রাওর শৈশবে হারিয়ে যাওয়া পৌত্রী সে খবরও আমরা পেয়েছি। আমাদের আশীর্বাদ করুন মা !

মুরলা : (বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে) আমি চলতে পারছি ! পায়ের জোর ফিরে এসেছে। মা ভবানীর প্রসাদে ভাল হয়ে গেছি—

ফুল্লরা : জয় মা ভবানীর জয় ! (সকলে এই জয়ধ্বনিতে যোগ দিলেন) (বাইরে বিবাহ উৎসবের বাদ্য বেজে উঠলো।)

—যবনিকা—
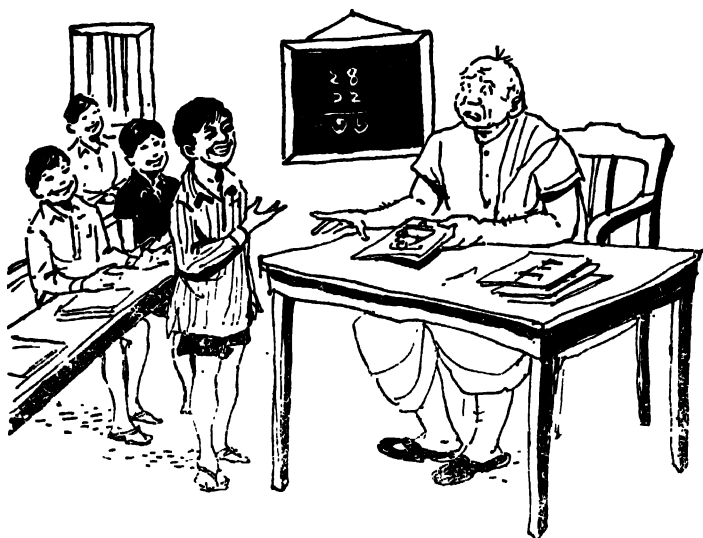
আমরা যখন স্কুলে পড়ি

স্থান—শহরের কাছাকাছি একটি গ্রাম।

কাল—রাত্রি, সকাল ও বিকেল।

পাত্র—মা, মাস্টারমশাই, অশোক, অভীক ও অন্যান্য ছাত্রগণ।

প্রথম দৃশ্য

রাত্রি

[অশোকদের খড়ের চাল মেটে বাড়ী—অশোক সদর বাড়ীর পড়ার ঘরে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। সামনে বই খোলা। হ্যারিকেন লণ্ঠনটা টেবিলের উপর নিবু-নিবু করছে, আর একটি হ্যারিকেন হাতে অশোকের মা এসে প্রবেশ করলেন সে ঘরে।]

মা। খোকা ওঠ্। খাবি আয়। রাত হয়ে গেছে ঢের। খোকা! এই! (গা ঠেলে)।

অশোক। (ধড়মড়িয়ে জেগে উঠে) কি বলছো মা?

মা। আহা বাছা রে। ঘুমিয়ে পড়েছিলি বুঝি? খিদে পেয়েছে খুব—না রে অশোক?

অশোক। হ্যাঁ মা। তোমার আজ রান্না করতে এত দেরী হল কেন?

মা। ওমা! তুই বুঝি কিছুই জানিস্ নি? এত হৈ হল্লা হল।

অশোক। কেন মা? আমি তো কিছুই শুনতে পাইনি।

মা। কি করে পাবি বল। ঘুমুচ্ছিলি যে। রান্নাঘরে একটু আগে একটা সাপ বেরিয়েছিল আজ।

অশোক। -সাপ! ওরে বাবা!

মা। হ্যাঁরে। সাপটার সঙ্গে আবার কিলবিল করছিল অনেকগুলো বাচ্চা সাপ!

অশোক। (ভয়ে আঁৎকে উঠে) ঈশ! কি সর্বনাশ। তারপর?

মা। আমাকে আর একটু হলেই ছোবল মেরেছিল আর কি!

অশোক। (চমকে উঠে) বলো কি! কি করে বেঁচে গেলে মা?

মা। সাপকে আমি ভীষণ ভয় করি জানিস্ তো? হাতের কাছেই দেখি বাটনা-বাটা শিলখানা পড়ে রয়েছে! টপ করে শিলখানা হু'হাতে তুলে নিয়ে ঝপ করে সাপের ঘাড়ে ফেলে দিয়ে পরিত্রাহি চেঁচিয়ে উঠলুম। আমার আওয়াজ শুনে লোকজন সব ছুটে এল। হ্যারিকেন লণ্ঠনটা তুলে দেখা গেল সাপটার পিঠের ওপর ঠিক মাঝামাঝি শিলখানা চাপা পড়েছে। ভারী শিলখানা ঠেলে সাপটা বেরুতে পারছিল না। নিষ্ফল আক্রোশে ছটফট করছে। লক্‌লকে জিভ বার করে মাথাটা কেবলই ডাইনে বাঁয়ে নাড়ছিল।

অশোক। আর বাচ্চাগুলো?

মা। সব শিলের তলায় চাপা পড়েছিল। লোকজন যারা দৌড়ে এসেছিল তারা লাঠির ঘায়ে সাপের মাথাটা থেঁতো করে দিলে। তারপর সেই লাঠির খোঁচা দিয়ে ঠেলে শিলখানা সরিয়ে দেখে বাচ্চাগুলো সব সেই শিলের তলায় চাপা পড়ে অক্কা পেয়েছে।

অশোক। উঃ। বড্ড বেঁচে গেছ মা। ভাগ্যিস্ বুদ্ধি করে শিলখানা তুলে চাপা দিয়েছিলে। ভগবান তোমাকে রক্ষা করেছেন। তারপর কি হল মা?

মা। তারপর আর কি? যা কিছু রান্না করেছিলুম সব ফেলে দিলুম। কি জানি যদি সাপে মুখ দিয়ে থাকে। আবার নতুন করে রান্না চাড়াতে হল। তাই রাত হয়ে গেল। চল খাবি চল, খুব খিদে পেয়েছে না রে? আহা—

অশোক। চল যাই। কিন্তু আমি ভাবছি মা, শীতকালে তো সাপগুলো গর্তে ঢুকে অসাড়ে ঘুমোয়। বাইরে তো বেরোয় না। তবে এ সাপটা তার বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে রান্না ঘরে ঢুকলো কেমন করে?

মা। কে জানে বাপু। শীতটা আজ খুব জোর পড়েছে কিনা, তাই হয়তো গরম উনুনের ধারে সাপটা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে আগুন পোয়াতে এসেছিল। চল্ খাবি চল্—

অশোক। চলো মা। কিন্তু ভাবছি…

[অশোক মায়ের সঙ্গে চলে গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্কুল যাবার পথ

[সময়ঃ সকাল।

দুটি ছাত্র অশোক ও অভীক কথা বলতে বলতে আসছে।]

অশোক। কাল সারারাত আমি ঘুমুতে পারিনি ভাই। ওঃ, সে যে কী দুঃস্বপ্ন তোমায় কি বলবো! যতবার লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করি তত বারই সেই ভীষণ স্বপ্ন দেখে ভয়ে আমার ঘুম ভেঙে যায়।

অভীক। কী এমন দুঃস্বপ্ন রে, যে সারারাত ধরে জেগে জেগে দেখলি।

অশোক। জেগে জেগে দেখিনি, ঘুমিয়ে দেখেছি।

অভীক। এই যে বললি, সারারাত কাল ঘুমুতে পারিনি।

অশোক। পারিনি তো। যেই একটু ঘুম আসছিল চোখে অমনি সেই ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন। সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের দফা-রফা।

অভীক। সারারাত সেই একই স্বপ্ন দেখছিলি বারবার?

অশোক। হ্যাঁ ভাই, আশ্চর্য। একে অন্ধকার ঘর, রাত থমথমে করছে, চারিদিক নিস্তব্ধ। শেয়াল কুকুর দূরে থাক একটা ঝিঁঝিঁ পোকারও ডাক শোনা যাচ্ছে না। শীতের চোটে সব জড়সড়। আমি যেই লেপ মুড়ি দিয়ে চোখ বুজিয়েছি অমনি সেই দুঃস্বপ্ন।

অভীক। আরে দুঃস্বপ্নটা কি তাই বল না। কেবল দুঃস্বপ্ন, দুঃস্বপ্ন!

অশোক। ওঃ। সে যে কী ভীষণ দুঃস্বপ্ন। শোন্ তবে তোকে বলি। কাউকে বলিস্ নি যেন।

অভীক। কেন বললে কি হবে?

অশোক। যদি আর কেউ সেটা দেখে ফেলে?

অভীক। ফেললেই বা। স্বপ্ন বই তো নয়। যদি আর কেউ দেখেই ফেলে তাতে তোর এত লজ্জা কিসের? আর লোকসানই বা কি?

অশোক। না না, ছি ছি! কী মনে করবে হয়তো ছেলেরা।

অভীক। এতে আর মনে করবার কী আছে? স্বপ্ন বই তো নয়। তবে খারাপ নয়ত খুব?

অশোক। আহা হা। তুই বুঝতে পারিস্‌নি ব্যাপারটা। এতো যেমন-তেমন একটা সাধারণ স্বপ্ন নয়! হ্যাঁ, খারাপ বই কি। ভীষণ রকমের একটা দুঃস্বপ্ন যে!

অভীক। দুত্তোর দুঃস্বপ্নের নিকুচি করেছে! বল কি দুঃস্বপ্ন তোর শুনি?

অশোক। এখন থাক, স্কুলে গিয়ে বলবো। নইলে ক্লাসে পৌছতে দেরী হয়ে যাবে।

অভীক। (হাতঘড়ি দেখে) ঢের দেরী আছে ক্লাসের। বলে ফেল এইবেলা।

অশোক। তবে শোন বলি।

[উভয়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

তৃতীয় দৃশ্য

স্কুলের পথ

[স্কুলের পথে অশোক আর অভীক কথা বলতে বলতে যাচ্ছে।]

অশোক। ভাবছি সেই সাপগুলো যদি হাওয়া পেয়ে আবার বেঁচে ওঠে, আবার কিলবিল করে তেড়ে আসে। কোনও রকমে খেয়ে নিয়ে চট করে শোবার ঘরে এলুম। মশারির ভেতর ঢুকে বিছানায় লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লুম; কিন্তু কিছুতেই ঘুম এল না। যতবার চোখ বোজবার চেষ্টা করি অমনি স্বপ্ন দেখি সেই সাপটা যেন একপাল বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সুড়সুড় করে লেপের ভিতর ঢুকে পড়ে কিলবিল করে ঘুরছে। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠলুম। মা ছুটে এসে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কী হয়েছে খোকন? ভয় পেয়েছিস্‌ বুঝি?' মাকে বললুম—'ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখেছি মা।' মা বললেন—'বোকা ছেলে! স্বপ্ন দেখে

ভয় পায় কখনো? ভয় নেই। স্বপ্ন তো আর সত্যি নয়। দুঃস্বপ্নে স্মর গোবিন্দ। 'গোবিন্দ' 'গোবিন্দ' বল দুঃস্বপ্ন কেটে যাবে। ঘুমো দেখি।'

অভীক। মাথার শিয়রে মা এসে বসায়—ঘুমিয়ে পড়লি তো?

অশোক। তাহলে তো বেঁচেই যেতুম। আমি ঘুমিয়েছি মনে করে মা যেই উঠে গেছেন আমিও চোখ বুজতে না বুজতে দেখি আবার সেই দুঃস্বপ্ন। লেপের ভেতর ছানাপোনা নিয়ে সেই সাপটি ঢুকে পড়ে কিলবিল করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ভয়ে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে লেপখানা ছুঁড়ে ফেলে দিলুম। মাকে আর ডাকিনি। সারারাত জেগে বসে রইলুম।

অভীক। দুর দুর, তুই ভারি বোকা। যেই স্বপ্ন দেখলি লেপের ভিতর সাপ ঢুকে কিলবিল করছে অমনি তুই কেন একটা বেজীকে স্বপ্ন দেখলি না? জানিসনি বেজি হলো সাপের সাক্ষাৎ যম। আজ আবার রাত্রে যদি লেপের ভিতর সাপ ঢুকেছে স্বপ্ন দেখিস—সঙ্গে সঙ্গে বেজির স্বপ্ন দেখবি; বেজিটা যেন সাপগুলোকে তাড়া করছে আর তারা প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমতে পারবি। বেজি দেখলে সাপ আর সে ত্রিসীমানায় থাকবে না।

অশোক। (ম্লান মুখে) স্বপ্ন কি আর ইচ্ছেমতো দেখা যায় ভাই? স্বপ্নে যদি বেজি না আসে।

[স্কুলের ঘণ্টা বেজে উঠলো।]

অভীক। চল চল ক্লাসে যাই, ঘণ্টা পড়ে গেল।

[অশোক ও অভীক ছুটে স্কুলের দিকে চলে গেল।

চতুর্থ দৃশ্য

[স্কুল—ক্লাসের ছেলেরা জটলা করছে।

মাস্টারমশাই ঢুকতে সব চুপ। এমন সময় অশোক আর অভীক এসে ঢুকলো]

মাস্টার। দেরী করে এলে কেন তোমরা?

অভীক। না স্যার, একপাল বাচ্চা শুদ্ধ একটা সাপ—

মাস্টার। বলো কি?

ছেলেরা। সাপ! কী সাপ? কোথায় দেখলে?

মাস্টার। সাপটা কি এখনও আছে সেখানে ?

অভীক। না স্যার, বেজি তাড়া করতেই পালিয়েছে। অশোক ভীষণ ভয় পেয়েছিল—

ছেলেরা। সাপের ছানাগুলোর কি হলো ?

অশোক। মা শিল চাপা—

অভীক। না স্যার, ও ভয়ে যা-তা বলছে। ছানাগুলোকে সব বেজিতে খেয়ে ফেললে ঃ তবে তো স্কুলে আসতে পারলুম।

মাস্টার। আচ্ছা, কি জাতের সাপ চিনতে পেরেছিল ?

অশোক। না স্যার, স্বপ্নে ঠিক বুঝতে পারিনি—

মাস্টার। স্বপ্নে—

অভীক। হ্যাঁ স্যার, স্বপ্নে—সেই স্বপ্নেটাকে জানেন না ? স্বপনকুমার—সাপুড়ে বেদেদের ছেলে। সে-ও ঠিক বুঝতে পারেনি কি জাতের সাপ। সড় সড় করে সরে পড়লো কি না। বেজি দেখে কি আর দাঁড়ায় ?

ছেলেরা। কোথায় দেখলে সাপটাকে ?

অশোক। মা—

অভীক। ওই অশোকদের বাড়ীর পথে রান্নাঘরের পেছনে গর্ত আছে বোধ হয়। স্বপ্নে সেটাকে ধরে আনবে বলেছে।

মাস্টার। আচ্ছা আর না। যেতে দাও সাপকে। এইবার সব পড়ায় মন দাও। আজ তোমাদের প্রথম ঘণ্টায় কি পড়া আছে—রুটিনে ?

ছেলেরা। অঙ্ক, স্যার।

অভীক। না স্যার, ভূগোল আছে।

মাস্টার। আচ্ছা আচ্ছা, আগে অঙ্ক হয়ে যাক তারপর ভূগোল।

অভীক। না স্যার, আগে অঙ্ক হলে যোগ বিয়োগ করতে আমার মাথা গুলিয়ে যাবে। তারপর—

মাস্টার। তার পর ভূগোল পড়া তো তোমার পক্ষে সহজ হয়ে যাবে। অঙ্কে মাথা গোল হলে ভূগোল আর শক্ত ঠেকবে না। আচ্ছা, তোমায় খুব সহজ অঙ্ক দিচ্ছি—বলো তো তোমার হাতে ক'টা আঙুল ?

অভীক। (কাঁদো কাঁদো ভাবে) গুণে দেখে বলবো স্যার ?

ছেলেরা। ও বাড়ী থেকে কিছু পড়ে আসেনি স্যার।

মাস্টার। আচ্ছা গুণেই বলো তুমি।

অভীক। (চেঁচিয়ে আঙ্গুল নিয়ে) একে চন্দ্র, দুইয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, চতুর্বেদ, পঞ্চবাণ, ছয় ঋতু, সাত সমুদ্র, অষ্ট বসু, নবগ্রহ, দশদিক—হয়েছে স্যার! দশটা আঙ্গুল।

ছেলেরা। না স্যার, ও ভুল গুণেছে। ওর বুড়ো আঙ্গুলের সঙ্গে জোড়া লাগা আর একটা করে ছোট আঙ্গুল আছে।

মাস্টার। আছে নাকি?

অভীক। আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

মাস্টার। তবে ভুলে দশটা বললে কেন?

অভীক। ও স্যার, ঠিক আঙ্গুল নয়। আঙ্গুলের গায়ে আঁটা ছোট্ট বাচ্চা আঙ্গুল। যেন মায়ের কোলে চড়া কচি ছেলে।

মাস্টার। না না, ওদের হিসাব ধরে নিয়ে গোণা। মোট ক'টা আঙ্গুল তোমার?

অভীক। আজ্ঞে ও দুটো ধরলে এক ডজন পুরো হয়ে যায়।

মাস্টার। আচ্ছা বেশ, এখন যোগ শিখলে তো? দশের সঙ্গে দুই যোগ করলে কত হবে?

ছেলেরা। বারো স্যার।

মাস্টার। চুপ। তোমাদের আমি জিজ্ঞাসা করিনি। আচ্ছা অভীক, এইবার বলো দেখি, তোমার ওই ছোট আঙ্গুল দুটি কেটে বাদ দিলে ক'টা আঙ্গুল বাকি থাকবে?

ছেলেরা। দশটা স্যার।

মাস্টার। আবার! একদম চুপ। অভীক বলবে—আচ্ছা, তোমার একটা হাত থেকে দুটো আঙ্গুল আর একটা হাত থেকে তিনটে আঙ্গুল যদি কেটে দিই—

অভীক। (কাতর ভাবে) দেবেন না স্যার। অতগুলো আঙ্গুল কাটলে মরে যাবো।

মাস্টার। (হেসে ফেলে) কতগুলো আঙ্গুল তোমার কেটে বাদ দিতে চাইছি বলতো?

অভীক। আজ্ঞে, এক হাতে দুটো, এক হাতে তিনটে।

মাস্টার। তাহলে দু'হাতে মিলিয়ে ক'টা বাদ গেল?

অভীক। তা অনেকগুলোই তো বাদ গেল স্যার!

অশোক। মোট পাঁচটা গেল।

অভীক। ওরে বাবা! তাহলে একটা হাত যে একেবারে ফুলো হয়ে যাবে।

মাস্টার। তুমি ওকে বলে দিচ্ছ কেন অশোক? ও নিজে হিসেব করে বলুক। থাকবে ক'টা?

অভীক। আজ্ঞে পাঁচটা গেলে পাঁচটা থাকবে?

[ছেলেরা হো হো করে হেসে উঠলো।]

মাস্টার। আহা হা! তোমরা হাসছ কেন? ও তো ঠিকই বলেছে। তোমাদের মত ওর দশটা আঙ্গুল যে নয়। বারোটা আঙ্গুল। বেচারা এটা ভুলে গেছে।

অশোক। হাতেই তো ওর আঙ্গুল রয়েছে তবু ভুল হয়ে গেল স্যার?

মাস্টার। তা কি হয় না? কানে কলম গোঁজা থাকলেও অনেকে কলম খুঁজে বেড়ায় জানো না?

অশোক। আঙ্গুল তো আর কানে গোঁজা নেই স্যার, আঙ্গুল তো হাতেই রয়েছে।

[ছেলেরা আবার হেসে উঠলো।]

মাস্টার। তোমার বাঁ হাতের আঙ্গুলগুলো থেকে যদি তিনটে আঙ্গুল কেটে বাদ দিই ক'টা থাকবে অভীক?

অভীক। আজ্ঞে স্যার, তা কিঁ করে বলবো? তিনটে কাটতে গিয়ে যদি ভুলে চারটে কেটে ফেলেন?

মাস্টার। আচ্ছা, তা যদি হয়, চারটেই যদি কেটে ফেলি, তাহলে ক'টা থাকবে?

অভীক। আজ্ঞে, চারটে আঙ্গুলের মধ্যে কি বাড়তি কচি আঙ্গুলটাও থাকবে?

মাস্টার। ধরো যদি থাকে—

অভীক। তাহলে দেড়টা আঙ্গুল থাকবে?

মাস্টার। দেড়টা! দেড় হয় কি হিসেবে?

অভীক। আজ্ঞে, কচি আঙ্গুলটা তো আর পুরো এক নয়। রেলে ছোট বাচ্চাদের হাফ টিকিট নেয়, মানে রেল কোম্পানী ওদের অর্ধেক লোক বলে ধরে।

মাস্টার। আচ্ছা, অঙ্কে পাস হয়ে গেছ। এইবার ভূগোলের পরীক্ষা শুরু হবে। বলো দেখি Atlas কাকে বলে?

অভীক। Atlas স্যার? Atlas হল অসুরের মত শক্তিশালী একটা দৈত্য যে এই পৃথিবীটা ঘাড়ে তুলে নিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে আছে।

[ছেলেরা সবাই হেসে উঠলো।]

মাস্টার। তোমরা হাসছ কেন?

অশোক। পৃথিবীর সব দেশের মানচিত্র যে বইয়ে আছে, তাকেই তো আমরা Atlas বলি স্যার।

মাস্টার। হ্যাঁ, তা বলি বটে, কিন্তু অভীকও যা বলছে তা-ও ঠিক। গ্রীক পুরাণে আছে Altas নামে এক প্রবল পরাক্রান্ত দৈত্য স্বর্গরাজ্য জয় করতে গেছলো। টাইটান পৃথিবীটা তার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে জব্দ করে রেখেছেন।

অভীক। আজ্ঞে, তা তো জানি না স্যার।

মাস্টার। তবে তুমি বললে কি করে?

অভীক। আজ্ঞে, ছবি দেখে। মানচিত্রের বইয়ের মলাটের ওপর ছবিটা আছে।

[ছেলেরা সবাই হেসে উঠল।
তারপর টিফিনের ছুটির ঘণ্টা পড়লো।
ছেলেরা হুড়মুড় করে ক্লাস ছেড়ে বেরিয়ে গেল।]

পঞ্চম দৃশ্য

[স্কুল।
টিফিনের পর ছেলেরা ক্লাসে এসে বসেছে।
মাস্টারমশাইর প্রবেশ।]

মাস্টার। এ বেলা তোমাদের আমি সাধারণ জ্ঞান সম্বন্ধে পরীক্ষা করতে চাই। ভয় নেই। যা জানতে চাইবো মন খুলে তার জবাব দিও। শোন একটা গল্প বলি। একদিন রাস্তায় এক গরীব ভিখারী মোটর চাপা পড়ে পা ভেঙে পড়েছিল। রামকৃষ্ণ মিশনের একজন সন্ন্যাসী সেই পথ দিয়ে যাবার সময় তাকে সেই অবস্থায় দেখে তুলে নিয়ে গেলেন আশ্রমের

হাসপাতালে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম সে এই আশ্রমে এসে প্রথম শুনলে। সাধুদের সেবা যত্নে ও চিকিৎসার গুণে লোকটি ক্রমে আরোগ্য হয়ে সুস্থ শরীরে ঘরে ফিরে গেল। যতদিন সে আশ্রমে ছিল, রোজই ধর্মালোচনা ও ভাগবতী কথা শোনবার সুযোগ পেতো। আশ্রম ছেড়ে চলে যাবার পর এ সুযোগ আর পায় না বেচারা; কিন্তু তার সমস্ত মন চাইতো ধর্মকথা শুনতে। এখন তোমরা কেউ বলতে পারবে কি, কেমন করে তার এ আকাঙ্খা পূর্ণ হবে?

[ছেলেরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।
কারুর মুখে আর কথা নেই।]

অভীক। (অনেক ভেবে) আচ্ছা স্যার লোকটা যদি আর এক পা ভেঙে আবার রাস্তায় গিয়ে পড়ে থাকে, তাহলে তো তার আশা পূর্ণ হতে পারে।

[ছেলেরা হেসে উঠলো।]

মাস্টার। (রেগে উঠে) তোমার পা ভেঙে দেওয়া দরকার দেখছি তার আগে।

অশোক। স্যার, এবার আমাদের ড্রয়িং ক্লাস নেবার সময় হয়েছে।

মাস্টার। বেশ তো, ড্রয়িংএর খাতা বার করো সব। তোমরা ভবিষ্যৎ জীবনে যে যা হতে চাও খাতায় এঁকে দেখাও আমাকে। দশ মিনিট মাত্র সময় পাবে।

[ছেলেরা সবাই আঁকতে বসে গেল।
একটি ছেলে দশ মিনিটি পরেই খাতা নিয়ে এল দেখাতে।]

মাস্টার। ইস্। তুমি যে দেখছি আকাশে উড়তে চাও। জেট বিমানের পাইলট হবার ইচ্ছা। বেশ বেশ।

(আর একটি ছেলে খাতা নিয়ে এল।)

আরে! তোমার দেখছি ইঞ্জিনের ড্রাইভার হবার সখ। ট্রেন চালাবে।

(আর একটি ছেলে খাতা এনে দেখালে।)

তাই তো! তুমি শেষে ডাক পিয়ন হয়ে বাড়ী বাড়ী চিঠি বিলি করে বেড়াতে চাও? খুব তো উচ্চ আকাঙ্খা দেখছি তোমার।

(আর একটি ছেলে খাতা এনে দেখাল।)

এ কি! তোমার কি বিয়ে করার সখ হয়েছে? বর এঁকেছ কেন?

ছেলেটি। না স্যার, বিয়ে করতে আমি চাই না। কিন্তু বর সাজতে খুব ইচ্ছে হয়।

[ছেলেরা হেসে উঠল।

এবার আর একটি ছেলে খাতা নিয়ে এল।]

মাস্টার। এ যে এক স্কুল-মাস্টারের ছবি দেখছি অভীক, তুমি কি শিক্ষক হতে চাও ?

অভীক। হ্যাঁ স্যার, যদি আপনার মত ছাত্র পাই।

[ছেলেরা হেসে উঠলো।

মাস্টার মশাই কিছু বলার আগেই ছুটির ঘণ্টা পড়ে গেল।

হৈ হৈ করে ছেলেরা উঠে পড়লো।]

—যবনিকা—

গল্প
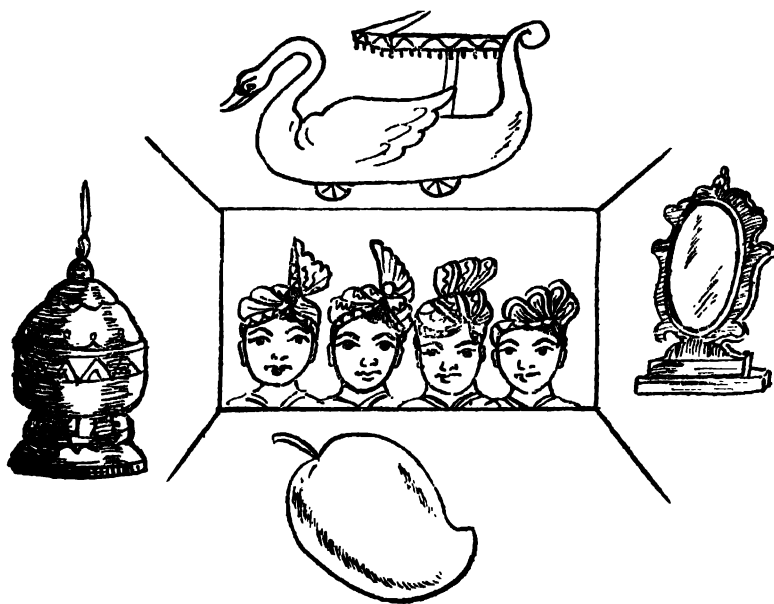
লাবু

এক

অনেকদিন আগের কথা।

এক দেশে এক রাজা ছিলেন। তিনি খুব জনপ্রিয়। প্রজারা সবাই তাঁকে ভারি ভালবাসতো। তিনি প্রায়ই ছদ্মবেশ পরে প্রাসাদ থেকে লুকিয়ে বেরিয়ে পড়তেন। রাজধানী ছাড়িয়ে আশে-পাশের গ্রামে এসে ঘুরে বেড়াতেন। নিজের চোখে দেখে আসতেন প্রজারা কেমন আছে। শুনতেন তারা নিজেদের মধ্যে কি বলাবলি করছে। তাদের অভাব অভিযোগ কি জানবার চেষ্টা করতেন। রাজকর্মচারীগণ কেউ তাদের উপর কোন অন্যায় অত্যাচার করছে কিনা তার খবর নিতেন।

একদিন হয়েছে কি, এমনি ছদ্মবেশে ঘুরতে ঘুরতে রাজা এক গ্রামে গিয়ে পড়লেন। সেখানে বেশির ভাগই দীন-দুঃখীদের বাস। তখন অনেক বেলা হয়ে গিয়েছিল। রোদের তাত বেড়ে উঠেছে খুব। পথে হাঁটতে রাজা বড়ই ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। ঘোড়াটিকে বেঁধে রেখে এসেছিলেন গ্রামের বাইরে এক গাছতলায়। রাজার খুব তৃষ্ণা পেয়েছিল। গলা শুকিয়ে উঠেছে

দেখলেন কাছেই বেশ পরিচ্ছন্ন একটি ছোট্ট কুটির। রাজা ধীরে ধীরে সেই কুটিরের দ্বারে গিয়ে ডাক দিলেন—বাড়িতে কে আছেন?

দরজা খুলে একটি মধ্যবয়স্কা মহিলা বেরিয়ে এলেন। ছদ্মবেশী রাজাকে দেখেই বুঝতে পারলেন ইনি একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক। সবিনয়ে জানতে চাইলেন—আপনি কাকে খুঁজছেন?

মহিলাটিকে দেখে রাজার মনে হ'ল ইনি দরিদ্র হলেও নিশ্চয় কোনো বড়ো ঘরের মেয়ে। তাই সসম্মানে অভিবাদন জানিয়ে বললেন,—আমার বড়ো পিপাসা পেয়েছে। একটু যদি ঠাণ্ডা জল দিতে পারেন মা, বড়ো উপকৃত হব।

মহিলাটি তাঁকে তাড়াতাড়ি একখানি আসন এনে বসতে বলে, তখনি চলে গেলেন কুয়ো থেকে ঠাণ্ডা জল তুলে আনতে।

পথশ্রান্ত রাজা আসনে এসে বসলেন। এই কুটিরটি রাজার খুব চেনা। তিনি বহুদিন এপথে যেতে যেতে এই ফুলের বাগান ঘেরা ঝরঝরে সুপরিচ্ছন্ন কুঁড়েঘরখানি দেখেন আর ভাবেন এ দরিদ্র পল্লীতে এমন সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে কারা এই পর্ণকুটিরে থাকেন? মাঝে মাঝে তার চোখে পড়ে একটি পরমা সুন্দরী মেয়ে হয়তো কখনো স্নান করে উঠে এলোচুলে শুভ্র শাড়ি পরে একটি সাজি হাতে ফুল তুলছে, অথবা কোনোদিন ঝকমকে নিকানো মাটির দাওয়ায় লক্ষ্মীপূজার আলপনা দিচ্ছে। কখনও বা এক ধারে বসে একমনে পুঁথি নিয়ে নিবিষ্টমনে পড়ছে। কখনও বা দেখেন মেয়েটি বসে ছবি আঁকছে। আবার কখনও বা দেখেন নিপুণ হাতে কুলোয় করে ধান চাল ঝাড়া-বাছা করছে। নয়তো কুয়ো থেকে জল তুলছে। মেয়েটিকে দেখে রাজার মনে কেমন যেন একটা মায়া পড়ে গিয়েছিল।

রাজা দাওয়ায় বসে ভাবছিলেন সেই মেয়েটিকে আজ দেখতে পাচ্ছি না কেন? সে আজ কি করছে? সে কি বাড়িতে নেই? দরজার ফাঁকে উঁকি দিয়ে দেখেন মেয়েটি আজ ঘরের ভিতর বসে ছুঁচসুতো নিয়ে এক মনে কি যেন একটা সেলাইয়ের কাজ করছে। ইতিমধ্যে মহিলাটি একটি রূপোর মতো মাজাঘষা ঝকঝকে কাঁসার সুদৃশ্য ঘটিতে রাজাকে পরিস্রুত ঠাণ্ডা জল এনে দিলেন।

রাজা জল পান করে পরম পরিতৃপ্ত হলেন। মহিলাটিকে জিজ্ঞাসা করলেন, —ঘরের মধ্যে ওই যে মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছি ওটি কি আপনারই মেয়ে? মেয়েটির নাম কি মা?

রাজার প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মহিলাটির দুই চোখ জলে ভরে উঠলো। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,—হ্যাঁ বাবা, অভাগিনী আমারই মেয়ে। ওর বাবা সুন্দরী মেয়ে হয়েছে দেখে আদর করে ওর নাম রেখেছিলেন লাবণ্যপ্রভা। আমরা ওকে 'লাবু' বলেই ডাকি। অল্প বয়সেই বেচারা পিতৃহীন হয়েছে। আমার স্বামী পুষ্পদণ্ডপুরের ধনী জমিদার ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁর অকালে মৃত্যু হওয়ায় জ্ঞাতিরা আমাদের অসহায় দেখে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ফাঁকি দিয়ে ঠকিয়ে নিয়ে আমাকে পথে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। আমার হাতে যা সামান্য টাকা-কড়ি ছিল, আর আমার যে সব মূল্যবান অলংকার ছিল তাই বিক্রি করে এই দরিদ্র পল্লীতে সামান্য একটু জমি নিয়ে এই কুঁড়েঘরখানি তুলে বসবাস করছি। মেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। পয়সার অভাবে বিয়ে দিতে পারছি না। ভগবানের দয়ার উপর নির্ভর করে আছি। তিনি যা করবেন তাই হবে।

রাজা সমস্ত কাহিনী শুনে খুবই দুঃখিত হলেন। মহিলাটিকে তাঁর আন্তরিক সহানুভূতি জানিয়ে বললেন,—আপনি কিছু ভাববেন না মা, আমি আবার যেদিন এদিকে আসব আপনার মেয়েটির জন্য একটি ভালো পাত্র দেখেশুনে ঠিক করে আসব। ওর বিয়ের টাকার জন্য কোনও চিন্তা নেই। যা খরচ লাগবে আমিই তা আপনাকে জোগাড় করে এনে দেব।

মহিলাটি তাঁকে কিছু বলবার আগেই রাজা উঠে চলে গেলেন। মহিলাটি অবাক হয়ে এই অপরিচিত দয়ালু লোকটির দিকে চেয়ে রইলেন। বার বার তাঁর মনে হতে লাগল—ইনি কি ঈশ্বরের প্রেরিত কোনও দেবদূত? আমার লাবুর জন্য সৎপাত্র ঠিক করে দেবেন বলে গেলেন। শুধু তাই নয়, মেয়ের বিয়েতে যা কিছু খরচপত্র দরকার হবে, সে টাকাও উনি জোগাড় করে দেবেন বললেন। এ ভগবানের দয়া ছাড়া হতে পারে না। নিশ্চয় উনি কোনও দানশীল ধনী মহাজন। চেহারা দেখলে সত্যিই ভক্তি হয়। জগতের কল্যাণের জন্যই এঁরা পৃথিবীতে আসেন।

দুই

দেখতে দেখতে এক সপ্তাহ কেটে গেল। সেদিনের সেই যে অপরিচিত অতিথি মানুষটি আবার আসব বলে গিয়েছিলেন তিনি তো কই আর এলেন না! হয়তো ভুলেই গেছেন। গরীব দুঃখীর কথা কি ধনী মহাজনদের মনে থাকে?

লাবু মাকে এই রকম চিন্তান্বিত ও উৎকণ্ঠিত দেখে কাতর হয়ে মাকে জিজ্ঞাসা করল,—মা, তোমার কি হয়েছে আমায় বল। তোমাকে বলতেই হবে, নইলে আমি ছাড়ব না।

মেয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধে স্নেহময়ী জননী মেয়েকে একদিন সব কথা খুলে বললেন। লাবু শুনে অভিমান করে বললে—আমায় তুমি তাড়িয়ে দিতে চাও মা! স্বীকার করি বটে মেয়ে বড়ো হলে তার বিবাহ হয় এবং সে স্বামীর ঘরে চলে যায়। কিন্তু, তোমার যে কেউ নেই! আমি চলে গেলে তোমায় কে দেখবে মা?

মা বুকের মধ্যে মেয়েকে টেনে নিয়ে আদর করে বললেন,—ওরে! যাদের কেউ নেই তাদের ভগবান আছেন। তুই চলে গেলে তিনিই আমাকে দেখবেন। আমি স্বার্থপরের মতো তোর জীবনটা আমার এ দুর্ভাগা জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে ব্যর্থ হতে দেব না। যদি ভালো ছেলের সন্ধান পাই তোর বিবাহ দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব, লাবু। নইলে যে মরেও আমি শান্তি পাব না।

লাবু মাথা হেঁট করে ম্লান মুখে বসে রইল।

এমন সময় বাইরে সেই অতিথির কণ্ঠ শোনা গেল,—কই গো মা! কোথা গেলেন? আসুন, আসুন, সব ঠিক করে ফেলেছি।

আঁচলে চোখ মুছে লাবুর মা ছুটে বেরিয়ে এলেন। অতিথিকে সসম্মানে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বসতে বললেন।

ছদ্মবেশী রাজা বললেন,—আমার আজ বসবার সময় নেই মা। আপনার মেয়ে কুমারী লাবণ্যপ্রভার জন্যে আমি একটি সুযোগ্য পাত্র ঠিক করে ফেলেছি। তাঁরা মেয়েটিকে দেখে আশীর্বাদ করতে চান। আমি মেয়েটিকে নিতে এসেছি। আপনার যদি কোন আপত্তি না থাকে, ওকে এখনি আমার সঙ্গে দিন। এই নিন, আপনার মেয়ের বিয়ের খরচপত্রের জন্যে আপাততঃ পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা রেখে দিন। হীরে-মুক্তোর গহনা যা লাগবে আমি গড়াতে দিয়েছি। বেনারসী শাড়ি, মাদুরার চেলী ইত্যাদি কনের কাপড়-চোপড়ও কেনা হয়ে গেছে। কোথায়? মেয়ে কই? ডাকুন তাকে।

মহিলার আনন্দ আর ধরে না। ছুটে ঘরের ভিতর গেলেন লাবুকে খুঁজতে। মায়ে ঝিয়ের বিদায়ের পালা শেষ হতে রাজা লাবুকে নিয়ে চলে গেলেন। রথ এসে কুটির দ্বারেই অপেক্ষা করছিল।

মহিলাটি এবারও অবাক হয়ে এই দয়ালু সদাশয় পরোপকারী ভদ্রলোকের

দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। ভাবতে লাগলেন, তাই তো! চিনি না, জানি না, সম্পূর্ণ অপরিচিত এক ভদ্রলোক আমার সোনার প্রতিমা মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন। পাত্রটি কে? কি করে? কোথায় বাড়ি? কোনও পরিচয়ই তো দিলেন না উনি। বিয়ের খরচের জন্য পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা আগাম দিয়ে গেলেন। গয়নাগাটি, শাড়ি-কাপড়ও সব কেনা হয়ে গেছে বললেন। তারপর মেয়েকে যদি বরপক্ষের পছন্দ না হয় তখন কি হবে? অবশ্য লাবু আমার অপছন্দ হবার মতো মেয়ে নয়। যে দেখবে তারই ভাল লাগবে। কিন্তু, যিনি লাবুর জন্য এত করছেন, তাঁর পরিচয়টা আজও জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেলুম। লোকটি জোচ্চোর নয় তো? পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আমার মেয়েকে কিনে নিয়ে পালালো না তো? লাবুর মা মনে মনে শিউরে উঠলেন। না না, লোকটি ভালো। ভালোমন্দ মানুষ তাদের আচরণ থেকেই বোঝা যায়! দূর হোক ছাই! আর ভাবতে পারিনি। ভগবানের মনে যা আছে তাই হবে।

তিন

তারপর হ'ল কি, রাজার ছিল চার-চারটি ছেলে। কিন্তু মেয়ে ছিল না একটিও। রাজপ্রাসাদে একটি রাজকন্যা না থাকায় রাণীর মনে কখনও সুখ ছিল না। কিন্তু রাজার রথ যখন রাজপুরীতে এসে থামলো এবং রাজা যখন লাবণ্যপ্রভার হাতখানি সস্নেহে ধরে রাণীর কাছে নিয়ে এলেন, লাবণ্যপ্রভার রূপ লাবণ্য দেখে রাণী একেবারে মুগ্ধ। সমাদরে লাবুকে নিজের মহলে নিয়ে গেলেন রাণী। বললেন—লাবু আমারই মেয়ে।

সেদিন থেকে রাজবাড়িতে লাবু রাজকন্যার মতোই বিশেষ সম্মানজনক স্থান অধিকার করে বসল। রাণী তাকে রাজকুমারীর উপযুক্ত আদরেই প্রতিপালন করতে লাগলেন। চারজন রাজকুমারও এতদিন পরে একটি বোন পেয়ে ভারি খুশি। বোনটিকে কে বেশি ভালোবাসে এই নিয়ে চার ভাইয়ের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা লেগে গেল। লাবুর যখন যা দরকার তখনই চার ভাই ছুটে গিয়ে তাই এনে হাজির করত। কিন্তু লাবুর সবচেয়ে বেশি ভাব হয়ে গেল ছোট রাজকুমারের সঙ্গে। বড়দা, মেজদা, সেজদা লাবুর চেয়ে বয়সে অনেক বড় কিন্তু ছোট রাজকুমারকে লাবুর প্রায় সমবয়সী বললেই

হয়। মাত্র দু' তিন বছরের বড়। তাই ছোটর সঙ্গে খেলাধুলো ও মেলামেশা করতে লাবুর একটুও কুণ্ঠা বা সংকোচ বোধ হত না।

রাজকুমারেরা লাবুকে রাজকুমারী বলেই জানতো। কিন্তু লাবণ্য যে রাজকুমারী নয়, সে যে রাণীমার পালিতা মেয়ে রাজপুত্রেরা কেউ তা না জানলেও রাজবাড়ির চাকর-দাসীরা সবাই এটা জানতো। মহারাজ যে তাকে দরিদ্রের কুটির থেকে নিয়ে এসেছেন, সারথির কাছে এ খবর তারা আগেই শুনেছিল।

এদিকে লাবণ্যপ্রভা রাজপ্রাসাদে রাজকন্যার মতোই আদর যত্নে ও মর্যাদার সঙ্গেই প্রতিপালিত হচ্ছিল। তার চেহারায় আর আচার-আচরণে কেউ বুঝতে পারত না যে সে রাজবংশের মেয়ে নয়। তাকে দেখলে মনে হ'ত যেন সে এই রাজপ্রাসাদেই জন্মেছে। দরিদ্রের কুটিরে যেন সে কোনওদিন প্রতিপালিত হয়নি। এমনিই অভিজাতপূর্ণ ছিল তার চালচলন।

একদিন ছোট রাজপুত্রকে লাবু বললে—চলুন না দাদা, আজ অপরাহ্নে একটু নদীর ধারে আরামে বেড়িয়ে আসা যাক্। সারথিকে রথ আনতে বলুন। কিন্তু শুধু আমরা দু'জনে যাব। আর কেউ নয়।

ছোটো রাজকুমার খুশি হয়ে তখনি ছুটলেন নিজের সারথিকে রথ আনবার কথা বলতে রাজপ্রাসাদের স্যন্দনশালায়। বললেন,—সারথি! অবিলম্বে তুমি রাজকুমারীর মহলে রথ নিয়ে হাজির হও। রাজকন্যা নদীর ধারে বেড়াতে যাবেন। একটুও যেন দেরি কর না।

সারথি ছোটো রাজকুমারের কথার ধরনে বিরক্ত হয়ে বললে,—ঈস্! তবু যদি উনি সত্যিই রাজকন্যা হতেন! তাহলে তো দেখছি আপনি আমাদের হাতে মাথা কাটতেন।

ছোটো রাজকুমার লাবণ্যকে ভয়ানক ভালোবাসতেন। সারথির এই রকম অবজ্ঞাপূর্ণ কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে ব্যাপার কি সব জানতে চাইলেন। সারথি তখন এই মেয়েটির সমস্ত ইতিহাস তাঁকে খুলে বললে। ছোটো রাজকুমার তখন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে দাদাদের কাছে ছুটে গিয়ে খবরটা জানিয়ে দিয়ে বললে,—লাবণ্য যখন সত্যিই আমাদের বোন নয় তখন আমরা যে কেউ তাকে বিয়ে করতে পারি তো। কি বলো?

বড়ো ভাই শুনে খুশি হয়ে বললেন,—নিশ্চয় পারি। ওই রকম একটি রূপে-গুণে সুন্দরী মেয়েই তো আমি খুঁজছিলুম। আমিই ওকে বিয়ে করব।

মেজ রাজকুমার বললেন,—বারে! ও যখন আমাদের বোন নয় তখন আমিই বা ওকে বিয়ে করব না কেন?

সেজ রাজকুমারও সেই কথা বললেন।

ছোটো রাজকুমার তখন কাতরকণ্ঠে বললে,—লাবু যে আমাদের বোন নয় এই খবরটা দিয়ে আমি যে তোমাদের কাছে ওকে বিয়ে করবার অনুমতি নিতেই এসেছিলুম। আমি যে ওকে তোমাদের সকলের চেয়ে বেশি ভালোবাসি।

লাবুকে নিয়ে তখন চার ভাইয়ের মধ্যে শুম্ভ-নিশুম্ভের দ্বন্দ্ব বেধে গেল।

রাজার কানে খবরটা পৌঁছতে তিনি তৎক্ষণাৎ রাজকুমারদের ডেকে আনিয়ে বললেন,—তোমরা চার ভাই পৃথিবীর চারদিকে বেরিয়ে পড়। তোমাদের মধ্যে যে লাবণ্যপ্রভার জন্য দেশ-বিদেশ ঘুরে সবচেয়ে আশ্চর্য আর অমূল্য জিনিস সংগ্রহ করে এনে লাবণ্যকে উপহার দিতে পারবে তার সঙ্গেই লাবণ্যের বিয়ে দেব আমি।

রাজার আদেশ শোনবামাত্র চার ভাই সেইদিনই হুড়মুড় করে পৃথিবীর চারদিকে ছুটলো সবচেয়ে আশ্চর্য আর অমূল্য জিনিস খুঁজে আনতে। যাবার সময় রাজা তাদের বলে দিলেন,—ঠিক তিরিশটি দিন সময় পাবে। তোমাদের মধ্যে যে যা সংগ্রহ করে আনতে পারবে তার ভিতর সবচেয়ে আশ্চর্য ও অমূল্য জিনিস হবে যার, সে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হবে। ফিরতে যদি কারুর একত্রিশ দিন হয়ে যায়, সে যত ভালো জিনিসই আনুক, বাতিল হয়ে যাবে।

চার

রাজার হুকুমে চারজন রাজকুমার পৃথিবীর চারদিকে বেরিয়ে পড়লেন আশ্চর্য ও অমূল্য জিনিস খুঁজে আনতে। বড়ো রাজকুমার চললেন উত্তর দিকে। মেজ রাজকুমার দক্ষিণ দিকে। সেজ রাজকুমার পশ্চিম দিকে। আর ছোটো রাজকুমার পূবদিকে।

উত্তরে অনেক দূর যাবার পর বড়ো রাজকুমার দেখলেন একটি বৃদ্ধ কারিগর একটি রাজহাঁসের মতো ডানা মেলা সুন্দর রথ তৈরি করছে। বড়ো রাজকুমারের দেখে ভারি পছন্দ হল। তিনি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কি রথখানি বেচবে?

বুড়ো বললে,—দাম পেলেই বেচবো।

রাজকুমার জানতে চাইলেন,—কত দাম ?

বুড়ো বললে,—একলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা !

রাজকুমার চমকে উঠে বললেন,—তোমার বেচবার ইচ্ছে নেই বোধহয়। নইলে এই সামান্য একখানা হাঁসগাড়ির এত দাম চাইবে কেন ?

বুড়ো হেসে বললে,—তুমি এর গুণ জান না তাই দাম বেশি মনে করছ। এটা হাঁসগাড়ি নয়। এর নাম 'পুষ্পকরথ'। এই রথে চড়ে যখন যেখানে যেতে চাইবে এক মুহূর্তে আকাশ পথে উড়ে এ রথ তোমাকে সেইখানে নিয়ে যাবে !

বড়ো রাজকুমার একথা শুনে তো ভারি খুশি। মনে মনে ভাবলেন, এমনি আশ্চর্য মূল্যবান জিনিসই তো আমি কিনে নিয়ে যেতে এসেছি। আর কোনও কথা না বলে লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বড়ো রাজকুমার 'পুষ্পকরথ'খানি কিনে ফেললেন।

এদিকে মেজ রাজকুমার দক্ষিণে অনেকদূর যাবার পর দেখতে পেলেন এক বৃদ্ধ কারিগর বসে বসে একমনে একখানি সুন্দর আয়না তৈরি করে কারুকার্যকরা হাতির দাঁতের ফ্রেমে বাঁধাচ্ছে। মেজ রাজকুমারের আয়নাখানি দেখে ভারি পছন্দ হল। জিজ্ঞাসা করলেন,—কারিগর, তুমি কি আয়নাখানি বেচবে ?

বুড়ো বললে,—দাম পেলে নিশ্চয় বেচব।

মেজ রাজকুমার দাম কত জানতে চাইলেন।

বুড়ো বললে,—এর দাম দেড় লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা।

মেজ রাজকুমার আয়নার দাম শুনে হেসে উঠলেন। বললেন,—কারিগর ! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে ? সামান্য একখানা আয়নার এত দাম চাইছ ? ও আয়না কি হীরে, মতি, পান্না দিয়ে গড়া ?

বুড়ো বললে,—এ সাধারণ আয়না নয়। এর নাম 'মায়াদর্পণ'। তোমার আপনজন যে যেখানে যত দূরেই থাক না কেন, তাকে যদি দেখবার জন্য তোমার মনপ্রাণ আকুল হয়ে ওঠে, এই আয়নার দিকে চাইলেই দেখতে পাবে সে কি অবস্থায় কোথায় আছে।

মেজ রাজকুমার আয়নার গুণ শুনে তৎক্ষণাৎ দেড় লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে আয়নাখানি কিনে ফেললেন।

এদিকে সেজ রাজপুত্র পশ্চিম দিকে যতদূর যান, কিছুই আশ্চর্য বা মূল্যবান জিনিস দেখতে পান না যে কিনে আনবেন। প্রায় যখন পশ্চিম দিকের পথ শেষ হয়ে আসছে এমন সময় সেজ রাজকুমার দেখতে পেলেন একজন বুড়ো কারিগর বসে একটি ছোট রূপোর কৌটো তৈরি করছে। কৌটোটি এত সুন্দর যে সেজ রাজকুমারের সেটি কেনবার ইচ্ছা হল। তিনি কারিগরকে জিজ্ঞাসা করলেন,—কৌটোটি কি তুমি বেচবে ?

কারিগর বললে,—বেচবো না কেন, কিন্তু তুমি কি এর দাম দিতে পারবে ? এ কৌটোর দাম দু' লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা। কারণ এর নাম 'মা-লক্ষ্মীর অক্ষয় ঝাঁপি।' এর মধ্যে টাকা রাখলে সে টাকা কখনো ফুরোবে না।

সেজকুমার একথা শুনে তৎক্ষণাৎ দু' লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সেই 'মা-লক্ষ্মীর অক্ষয় ঝাঁপি' কিনে ফেললেন।

এদিকে সমস্ত পূবদিক চষে ফেলেও ছোটো রাজকুমার কোনও আশ্চর্য ও অমূল্য জিনিস দেখতে পেলেন না। তিনি যখন হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরছেন সেই সময় তাঁর চোখে পড়ল একটি বৃদ্ধ মৃৎশিল্পী বসে একটি পাকা আম তৈরি করছে। আমটি এমন চমৎকার যে দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে। মাটির আম বলে বোঝাই যায় না। সরস পাকা ফলটি থেকে মধুর সৌরভ বিকীর্ণ হচ্ছিল। ছোটো রাজকুমার ফলটি কিনতে চাইলেন। বৃদ্ধ শিল্পী বললে,—তুমি কি এর দাম দিতে পারবে ? আড়াই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিলে এটি তোমায় দিতে পারি।

ছোটো রাজকুমার তার কথা শুনে একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন,—শিল্পী! তুমি কি আমাকে এতই নির্বোধ ভেবেছ। একটা সামান্য মাটির আম, স্বীকার করি খুব ভালোই তৈরি করেছ, কিন্তু অত চাইছ কি বলে ?

শিল্পী হেসে বললে,—সত্যিই তুমি নির্বোধ। দাম শুনে বুঝতে পারছ না যে এটি সামান্য জিনিস নয়। এ অমূল্য ধন। এর নাম 'অমৃত ফল'। এ যে খাবে সে আর মরবে না!

ছোটো রাজকুমার তখন আড়াই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সেই অমৃত ফলটি কিনে বাড়ির পথে পা বাড়ালেন। কারণ, তিরিশ দিন পূর্ণ হতে আর বেশি দেরি নেই।

পাঁচ

ফেরার পথে এক সরাইখানায় চার ভাইয়ের পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সবাই সবাইকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি কি কিনেছ? তুমি কি কিনেছ? কিন্তু কেউ কাউকে বলতে চায় না।

ছোটো রাজকুমার বললেন,—চল ভাই বাড়ি যাই। লাবণ্যর জন্য আমার বড়োই মন কেমন করছে। প্রায় এক মাস হতে চলল তাকে দেখিনি। আমার তাকে বড্ড দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে।

মেজ রাজকুমার বললেন,—ভাবিসনি। তোকে আমি এখনি দেখিয়ে দিচ্ছি। তিনি তাঁর ঝুলির ভিতর থেকে সেই 'মায়াদর্পণ' খানি বার করলেন। বললেন,—চেয়ে দেখ, এর মধ্যে লাবণ্যকে দেখতে পাবি।

লাবণ্যকে দেখবার ইচ্ছা সবারই মনে ছিল। তাই সবাই ঝুঁকে পড়ল আয়নার মধ্যে তাকে দেখতে। দেখে কিন্তু সবার মুখ শুকিয়ে গেল। লাবু কঠিন রোগে মৃত্যুশয্যায়। বাঁচবার কোনও আশা নেই। প্রাসাদে ফিরতে আর মুহূর্ত বিলম্ব করলে লাবণ্যর সঙ্গে শেষ দেখা হবে না। কী হবে? কেমন করে যাবে তারা? রাজধানী এখনও অনেকদূর।

তখন বড়ো রাজকুমার বললেন,—ভয় নেই কিছু, আমি এক আশ্চর্য 'পুষ্পক রথ' কিনেছি। তাইতে চড়ে এই মুহূর্তে আমরা রাজপ্রাসাদে গিয়ে হাজির হব।

শোনবামাত্র চার ভাই পুষ্পকরথে চড়ে রওনা হতে যাবে এমন সময় সরাইখানার মালিক এসে বললে,—আমার পাওনা টাকাটা মিটিয়ে না দিলে আমি কাউকে যেতে দেব না এখান থেকে। সব জিনিসপত্র কেড়ে নিয়ে বাজেয়াপ্ত করব।

চার ভাই অর্থকোষ খুলে দেখে কারুর কাছে এক কপর্দকও নেই। কী হবে? কেমন করে সরাইখানার পাওনা মিটিয়ে তারা বাড়ি যাবে? তখন সেজকুমার বললেন,—কিছু ভয় নেই, আমার কাছে আছে 'মা-লক্ষীর অক্ষয় ঝাঁপি'। যত টাকা চাই দিতে পারব।

শুনে সবাই যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তখন সেই ছোট্ট রূপোর কৌটো খুলে সরাইওয়ালার পাওনা মিটিয়ে পুষ্পকরথে চড়ে চার ভাই একমুহূর্তে হুস্ করে রাজপ্রাসাদে উড়ে এল।

ছয়

এসে দেখে লাবণ্যপ্রভার অসুখ সেদিন খুবই বেড়েছে। রাজবৈদ্য বলে গেছেন জীবনের কোন আশা নেই। আর অল্পক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু সুনিশ্চিত। এ রোগের কোনও ওষুধ নেই। রাজা রাণী বিষণ্ণ ও চিন্তিত। ছোট রাজকুমার তখন এগিয়ে এসে বললেন,—আমায় অনুমতি করুন পিতা, আমি লাবণ্যপ্রভাকে এখনি আরোগ্য করে দিচ্ছি।

বলেই, ছোট রাজকুমার তাঁর থলির ভিতর থেকে সেই আমটি বার করে লাবণ্যপ্রভাকে একটু একটু করে খাইয়ে দিলেন। লাবণ্যপ্রভা এতদিন কিছু খাচ্ছিল না। ছোট রাজকুমার এসে তাকে 'খাও' বলতে সে রাজকুমারের দিকে চেয়ে একটু ম্লান হেসে নীরবে আমটি খেলে।

দেখতে দেখতে মরণোন্মুখ লাবণ্যপ্রভা আবার সুস্থ সবল ও সজীব হয়ে উঠল। নিশ্চিত মৃত্যুর মুখ থেকে তাকে ফিরে আসতে দেখে সবার মুখে আনন্দের হাসি ফুটলো। রাজপ্রাসাদের সবাই যেন এতদিনে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

লাবণ্যপ্রভা সম্পূর্ণ সেরে উঠে ঠিক আগের মতো আবার হাসিমুখে চঞ্চল চরণে পার্বত্য ঝরণার মতো ছুটে বেড়াচ্ছে দেখে, রাজা খুশিমনে একদিন চার রাজকুমারকেই কাছে ডেকে বললেন,—তোমরা চার জনেই আশ্চর্য ও বহুমূল্য জিনিস সংগ্রহ করে এনেছ, যার ফলে লাবণ্যপ্রভা যমের মুখ থেকে প্রাণ নিয়ে ফিরে এসেছে। কিন্তু আমার বিবেচনায় ছোট রাজকুমারের সঙ্গে তার বিবাহ হওয়া উচিত। কারণ তার ঐ আমটি না থাকলে লাবণ্য বাঁচতো না।

বড়ো রাজকুমার সবিনয়ে বললেন,—বুঝলুম। কিন্তু আমার 'পুষ্পকরথ' না থাকলে, আম কি ঠিক সময়ে এসে পৌছতো?

মেজ রাজকুমার বললেন,—আমার 'মায়াদর্পণ' না থাকলে লাবণ্যর অসুখের খবরই তো কেউ জানতে পারত না।

সেজ রাজকুমার বললেন,—আমরা তো সব কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েছিলুম। আমার কাছে 'মা লক্ষ্মীর অক্ষয় ঝাঁপি' না থাকলে সবাইকে তো আজও টাকার দায়ে সরাইখানাওয়ালার হাতে বন্দী হয়ে থাকতে হত।

রাজা তখন ধীরভাবে ছেলেদের বুঝিয়ে বললেন,—মেজকুমারের 'মায়া দর্পণে' লাবণ্য আসন্ন মৃত্যুর খবর পেয়েছ তোমরা একথা ঠিক। বড়োকুমারের

'পুষ্পকরথ' না থাকলে এত শীঘ্র কেউ রাজপ্রাসাদে এসে পৌছতে পারতে না, একথাও ঠিক। আর সেজকুমারের 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' না থাকলে সরাইখানার মালিক তোমাদের আটকে রাখতো, এ কথাও ঠিক। কিন্তু একবার ভালো করে ভেবে দেখ—ছোটকুমার 'অমৃত ফল' নিয়ে তোমাদের সঙ্গে না এলে, শুধু তোমরা এসে কি লাবণ্যকে প্রাণে বাঁচাতে পারতে? আর একটা কথা—বড়োর 'পুষ্পক রথ' বজায় আছে, মেজোর 'মায়াদর্পণ' অক্ষত আছে, সেজোর 'লক্ষ্মীর ঝাঁপি' অক্ষয় হয়েই রয়েছে, কিন্তু ছোট রাজকুমারের 'অমৃত ফল' তো সে রাখেনি একটুও। সব দিয়েছে লাবণ্যকে খাইয়ে। সুতরাং ছোট রাজকুমারই লাবণ্যকে বিবাহ করবার অধিকারী। কারণ প্রকৃতপক্ষে ছোটই লাবণ্যের প্রাণদান করেছে।

তখন তিন ভাই হাসিমুখে এগিয়ে এসে ছোট ভাইয়ের হাতেই লাবণ্যকে সঁপে দিল।

নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা

ভদ্রলোকের ছেলে। নাম তার মনুদাস। লেখাপড়া খুব বেশি শেখেনি। কিন্তু, হাতের কাজ জানে খুব ভাল। সব রকম শিল্পকাজই শিখেছিল সে। লোকে তাকে তার গুণের জন্য খুব খাতির করতো। মনুদাসের সুনাম ছিল পাড়ায়। সবাই বলতো সে বেশ দিলদরিয়া লোক। রোজ সে যা রোজগার করতো সমস্তই খরচ করে ফেলতো। নিজে ভাল খায়। ভাল পরে। গরীব দুঃখীর প্রতি তার খুব দয়া। হাতে কিছু থাকলে সে ভিক্ষুককে কখনো ফেরায় না। এক পয়সাও জমায় না। কাল কি হবে ভাবে না।

মনুদাসের বাড়ির পাশেই থাকে ননীবাবু। ননীবাবু খুব বড় লোক। তাঁর বড়বাজারে মস্ত দোকান আছে। অনেক টাকা উপার্জন করেন। কিন্তু, ননীবাবু ছিলেন ভীষণ কৃপণ। এক পয়সা খরচ করতে তাঁর মায়া হয়। তিনি খাটো মোটা সস্তা দামের কাপড় জামা পরেন। পাছে খরচ বেশি হয় বলে শুধু ডাল ভাত খেয়ে থাকেন। ভিখিরীরা কেউ তাঁর বাড়ি এলে এক মুঠো চালও পায় না। ননীবাবুর স্ত্রীর মনে তাই ভারি কষ্ট। ননীবাবুর স্ত্রী যখন মনুদাসের বাড়ি যায়, দেখে মনুদাসের স্ত্রী দামী শাড়ী পরে, তার

গায়ে এক গা গয়না। ওরা রোজ ঘি ভাত, দুধ ক্ষীর, মাছ মাংস কত কি খায়। আর ননীবাবুর স্ত্রীর হাতে শুধু শাঁখা রুলী। কৃপণ স্বামীর পাল্লায় পড়ে দু'বেলা পেট ভরে খেতে পায় না বেচারা। সে রোজই মনুদাসের বাড়ি থেকে ফিরে স্বামীকে বলে—তোমার টাকা রোজগার করা মিথ্যে। যদি আমরা ভাল করে খেতে পরতেই না পাই, টাকা জমিয়ে কি লাভ? জানো কি পাড়ায় কেউ তোমার নাম করে না। বলে ও' কৃপণের নাম করলে হাঁড়ি ফেটে যায়।

ননীবাবু স্ত্রীর কাছে রোজ এই রকম বকুনি খেয়ে শেষে বিরক্ত হয়ে নিজেই এলেন একদিন মনুদাসের বাড়ি। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলেন,—আপনি কি টাকা পয়সা কিছুই জমান নি?

মনুদাস বললে,—আজ্ঞে না, আমি রোজ আনি, রোজ খাই। টাকা-পয়সা জমাবো কার জন্যে? আমার তো ছেলে-মেয়ে কেউ নেই। তাছাড়া মানুষ আজ আছে কাল নেই। কবে আছি কবে নেই। যে ক'দিন বাঁচি ভাল করে খেয়ে পরে ভোগ করে যাই।

ননীবাবু বললেন,—বুঝলুম ভায়া। কিন্তু, এ কথাটাও তো ভাবা উচিত যে, আজ সুস্থ সবল আছেন, তাই খেটে খেতে পাচ্ছেন। কাল যদি একটা বড় অসুখ-বিসুখ হয়, বিছানায় পড়ে থাকেন, ভগবান না করুন, তাহলে তো রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে যাবে! তখন, খাবেন কি? আর চিকিৎসাই বা করবেন কেমন করে? দুঃসময়ের জন্য কিছু সংস্থান রাখা উচিত নয় কি? এমন করে নিঃশেষে সব টাকা খরচ করে ফেলা কি বুদ্ধিমানের কাজ? আপনি একটু ভেবে দেখবেন আমার কথাগুলো।

ননীবাবু চলে আসবার সময় ইচ্ছে করেই একটি টাকার থলে ফেলে এলেন মনুদাসের ঘরে। মনুদাস সেটা দেখতে পায়নি। কিন্তু, মনুদাসের স্ত্রী ঘরখানি পরিষ্কার করতে গিয়ে টাকার থলিটা পেলে। তাড়াতাড়ি থলিটি নিয়ে স্বামীর কাছে গিয়ে বললে,—তুমি কি রকম অসাবধানী লোক লোক বলো তো? বাইরের ঘরে টাকার থলেটা ফেলে এসেছো; ভাগ্যে আর কেউ আসেনি। নইলে তো এখুনি চুরি হয়ে যেতো!

মনুদাস অবাক হয়ে বললে,—টাকার থলে আমি কোথায় পাবো? আমি শিল্পী মানুষ। রোজ দু'টাকা-চারটাকা যা পাই সবই তো খরচ করে ফেলি। এ থলেটা নিশ্চয় পাশের বাড়ির ননীবাবুর। তিনি একটু আগে আমার

কাছে এসেছিলেন। সম্ভবতঃ তিনিই এটা ফেলে গেছেন। লোকটা টাকার কুমীর। কিন্তু কৃপণের যাশু! এক পয়সার জন্যে মরে বাঁচে। দাও, থলিটা ননীবাবুকে ফিরিয়ে দিয়ে আসি।

ছুটলো মনুদাস টাকার থলি নিয়ে ননীবাবুর বাড়ি। ননীবাবু শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন। বললেন,—আপনি কি পাগল হয়েছেন মনুবাবু? আমার সব টাকা জমা থাকে লোহার সিন্ধুকে। একটি পয়সা আমি বাইরে রাখিনি। ও আমার থলে নয়।

মনুদাস ভাবলে ননীবাবুর মতো কৃপণ লোকের টাকার থলে হলে তিনি কখনই ছাড়তেন না। নিশ্চয়ই আর কেউ ফেলে গেছে। ননীবাবু যে ইচ্ছে করেই টাকার থলে তার বাড়ি রেখে এসেছিল একথা একবারও তার মনে হল না। কিন্তু এ টাকার থলি তবে কার?

অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে মনুদাস ফিরে এল। তার স্ত্রী বললে—তবে রেখে দাও ওটা। যদি কেউ খুঁজতে আসে তাকে দিও।

মনুদাস বললে,—ঠিক বলছো তুমি। তুলে রেখে দিই থলেটা। যার থলি সে চাইতে এলে ফিরিয়ে দেব।

কিন্তু অনেকদিন হয়ে গেল তবু কেউ সে থলে নিতে এল না। তখন মনুদাস একদিন থলেটা খুলে গুনে দেখতে বসলো। কত টাকা আছে এর মধ্যে? গুনে দেখলে মোট ৯৯ টাকা রয়েছে। ভাবলে বোধহয় তার গোনার ভুল হয়েছে। নিশ্চয় ১০০ টাকা ছিল। কিন্তু, দু'বার তিনবার গুনে দেখলে, না, ১০০ টাকা নয়। একটা টাকা কম আছে। মোট ৯৯ টাকা।

টাকাগুলো গুনতে গুনতে মনুদাসের মনে একটু লোভ হল। সে ভাবলে কেউ যখন থলিটা নিতে এল না তখন আমার কাছেই থাক। কিন্তু ৯৯ টাকা ভাল লাগছে না। ওতে আমি আজকের রোজগার থেকে একটাকা দিয়ে পুরো একশো টাকা করে রাখি। মনুদাসের সেদিন মোট দু'টাকা উপার্জন হয়েছিল। তা থেকে একটাকা থলেয় রেখে বাকি এক টাকায় সেদিন কম খরচেই খাওয়া-দাওয়া সারলে।

হঠাৎ ননীবাবুর সেদিনের একটা কথা মনুদাসের মনে পড়ে গেল। 'যদি অসুখ-বিসুখ হয়, দু'মাস বিছানায় পড়ে থাকেন, তাহ'লে চলবে কেমন করে? 'রোজ আনি রোজ খাই' তখন বন্ধ হয়ে যাবে যে!'

মনুদাস ভাবলে, কথাটা ঠিকই বলেছে ভদ্রলোক। দুঃসময়ের জন্য কিছু সঞ্চয় থাকা খুবই দরকার। এই এক থলে টাকা যখন কেউ নিলে না, তখন ভগবানের দেওয়া টাকাটাই রাখা থাক না। অসময়ে কাজ দেবে। স্ত্রীকে ডেকে মনুদাস তার অভিপ্রায় জানালে। স্ত্রী বললেন,—ঠিকই তো! কিছু টাকা হাতে জমিয়ে রাখা খুবই দরকার। সময় অসময়ের কথা কে বলতে পারে?

এরপর থেকে টাকা জমাবার ঝোঁক মনুদাসকে এমন পেয়ে বসলো যে সেই একশো টাকা কিসে দু'শো হয়, কেবল সেই চেষ্টা করতে লাগলো। দেখতে দেখতে মনুদাসের সেই একশো টাকা ক্রমে পাঁচশো টাকা হয়ে উঠলো। কিন্তু টাকা জমলে কি হবে? মনুদাসের সেই ভাল খাওয়া-পরা আর চলল না। গরীব-দুঃখীরা আর কিছু পায় না। ভিখিরীরা এসে শূন্য হাতে ফিরে যায়।

ননীবাবুর স্ত্রী একদিন মনুদাসের বাড়ি থেকে ফিরে এসে স্বামীকে বললে,—ওগো! ব্যাপার কি বলো তো? মনুদাসের বাড়ি দেখে এলুম ওদের খাওয়া দাওয়া আমাদের চেয়েও খারাপ হয়ে পড়েছে! কোনওদিন রাঁধে, কোনও-দিন রাঁধে না।

ননীবাবু কথাটা শুনে খুশী হ'য়ে একেবারে মনুদাসের বাড়ি এসে হাজির। বললেন,—দাদা এখন তো আপনার অনেক টাকা হয়েছে। দিনরাত কাজ করে বেশ রোজগার করছেন। এইবার গরীবের সেই ৯৯ টাকা ফিরিয়ে দিলে বড় খুশী হবো।

মনুদাস আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—সে কি কথা? আপনার কাছে কবে আবার টাকা নিলুম আমি?

ননীবাবু তখন মনুদাসকে সেই ৯৯ টাকার থলির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বললেন,—ওই টাকাটা আমিই লুকিয়ে আপনার ঘরে রেখে গেছলুম আপনাকে নিরেনব্বুইয়ের ধাক্কায় ফেলবার জন্যে। আমার উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। এখন টাকাটা ফেরত পেলে বেঁচে যাই।

মনুদাস আর কি করে! সত্যিই তো, সেই প্রথম পাওয়া ৯৯ টাকা তার নয়। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে, নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও সেই ৯৯ টাকা সে ননী-বাবুকে ফেরত দিলে বটে, কিন্তু সেই 'নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা' আর কিছুতেই সামলে উঠতে পারলে না। সঞ্চয়ের ঝোঁকে শেষে কোনো কোনোদিন না খেয়েও ক্রমাগত টাকা জমাতে লাগলো। একেই বলে—'নিরেনব্বুয়ের ধাক্কা!'
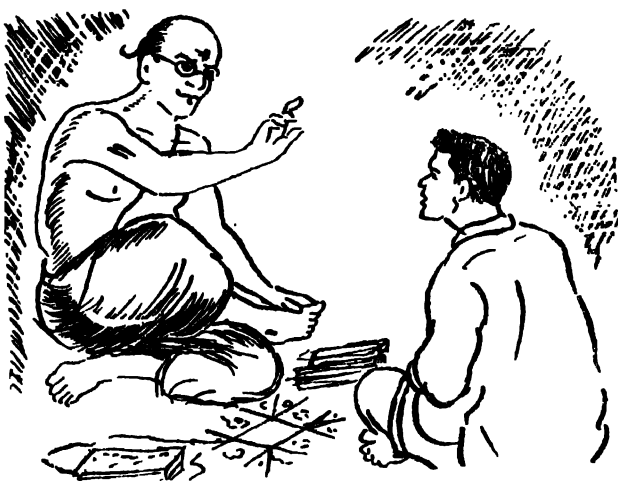
বোকাদা

এ নামটা কিন্তু তার বাপ-মার দেওয়া নয়, পাড়ার ছেলেরা রেখেছে। স্কুলে লেখানো আছে—শ্রীসুবুদ্ধিসুন্দর সেন।

সুবুদ্ধিসুন্দরকে ছেলেরা 'বোকাদা' বলতে শুরু করে যেদিন সে মহাকবি কালিদাস হবার জন্য তাদের বাগানের আম গাছের ডালে বসে সেই ডালটাই কাটতে গিয়ে মাটিতে পড়ে পা ভেঙেছিল।

সুবুদ্ধিকে যখন জিজ্ঞেস করা হল এ দুর্বুদ্ধি তোর হল কেন?

সে বললে,—আমি ভেবেছিলুম মা সরস্বতী এসে মহাকবি কালিদাসের মত আমাকেও তাঁর বরপুত্র করে নেবেন।

হঠাৎ সরস্বতীর বরপুত্র হবার ঝোঁক হল কেন জিজ্ঞেস করায় সুবুদ্ধি বলেছিল,—সামনে ম্যাট্রিক পরীক্ষা। পড়াশুনো ভাল তৈরি হয়নি, তাই—

সরস্বতীর বরলাভ তার ভাগ্যে না জুটলেও পা-ভেঙে হাসপাতালে পরে থাকায় সে বছর ম্যাট্রিক পরীক্ষার কবল থেকে সে বেঁচে গিয়েছিল। কিন্তু সুবুদ্ধি নামের বদলে তখন থেকে সে 'বোকা' নামেই পরিচিত হয়ে পড়লো।

পরের বারে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সে পরীক্ষা দিতে গেল বটে, কিন্তু পাশ করতে পারলে না। ফেল হয়ে পড়াশুনো ছেড়ে দিতে বাধ্য হল। এর প্রধান কারণ, স্কুলশুদ্ধ ছেলেরা তাকে ক্ষেপাতে শুরু করেছিল। তাকে দেখলেই একজন আর একজনকে ডেকে বলতো 'এই যে সরস্বতীর বরপুত্র চলেছেন!' তার চলার অনুকরণে অনেকে খুঁড়িয়ে চলতো তার সামনে দিয়েই।

বোকাদার পক্ষে এ সব ক্রমশঃ অসহ্য হয়ে পড়ায় সে স্কুলে যাওয়া ছেড়ে দিয়ে বাড়িতেই বসে রইল।

ইংরেজীতে একটা প্রবাদ আছে 'অলস মস্তিষ্কই কুচিন্তার আশ্রয়!' বোকাদার বাপ-মা সেই ভয়ে ছেলেকে বাড়িতে বসিয়ে না রেখে একটা কাজকর্মে কোথাও ঢুকিয়ে দিতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু খোঁড়া ছেলেকে কেউ কাজ দিতে চায় না।

অনেক চেষ্টার পড় শেষে এক মাড়োয়াড়ীর গদিতে তার চাকরি হল। ইংরেজী চিঠিপত্রের জবাব আর বাংলা সেরেস্তার কাজ।

আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবেরা তাকে যখন জিজ্ঞাসা করে,—হ্যাঁরে, কোথায় কাজ হল তোর?

সে বলে,—বড়বাজারে।

—বড়বাজারের কোথায়?

—পগেয়াপটিতে।

লোকে বিরক্ত হয়ে বলে—ঠিকানা চাইনি। কোন গদিতে কাজ পেয়েছিস তার নামটা বল না।

—ও! তাই বলুন! গদির নাম 'পলাতকরাম ভাগলরাম!'

শুনে সবাই হেসে উঠে বললে,—নামটা কি তোর দেওয়া, না সত্যিই ঐ নাম?

বোকাদার মামা সেখানে ছিলেন। বললেন,—ছেলেটা নীরেট! চাকরি তো আমিই করে দিয়েছি ওকে। গদির নামটাও বলতে পারে না। গদির নাম হল 'পলতুখ্‌রাম ভগৎরাম।'

বোকাদা বললে,—তুমি ঠিক জান না মামা। ওই ঠিকানায় ওদের আর একটা গদি রয়েছে তার নাম 'টেক্ চাঁদ নট গিভ্‌মল!'

এবার মামাও হেসে ফেললেন। বললেন,—তোর চাকরি দেখছি রাখতে পারবি নি। গদির নামগুলোও বলতে পারিস নি কাজ করবি কি? ও গদিটার নাম হল 'টিকমচাঁদ নথুজী মল!' তুই তাকে ইংরেজী বাংলা মিশিয়ে করে দিলি 'টেকচাঁদ নটগিভ্‌মল?'

বোকাদা একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে বললে,—ও রকম একটু আধটু হয়েই থাকে মামা। বর্ধমান যদি 'বারডোয়ান' হতে পারে আর 'বারানসী' যদি 'বেনারস্' হয়—এ আর এমন কি বেশি?

বোকাদার যুক্তি অকাট্য। সবাই চুপ হয়ে গেল।

তারপর বোকাদা একদিন আর এক কাণ্ড করে বসলো।

অফিস থেকে ফেরবার পথে দেখে ফুটপাতে বসে এক গণৎকার লোকজনের হাত দেখে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান বলে দিচ্ছে।

বোকাদার ভবিষ্যৎ জানবার ভয়ানক লোভ হল। সেও এক ফাঁকে বসে গেল ফুটপাতে হাত দেখাতে।

গণৎকার অনেক্ষণ তার হাতখানা উল্টে-পাল্টে দেখে গম্ভীরভাবে বললে,—তাই ত! রাজা হবার লক্ষণ দেখছি যে! খুব ভাল হাত তোর। বলছি সব। আগে সওয়া পাঁচ আনা পয়সা রাখ তোর হাতের ওপর। বিবাহ করিছিস্?

—আজ্ঞে না। বলে বোকাদা পকেট হাতড়ে ট্রামভাড়ার পয়সা যা ছিল বার করে দেখলে পাঁচ আনার বেশি হয় না।

গণৎকার বলল,—কুচ ভাবনা নেই বেটা। এক পয়সা হাম দেতা। কাল হামকো ফিরতি দেও।

তাই হল। গণৎকার একটা পয়সা বার করে বোকার পাঁচ আনার ওপর রেখে একটা মন্ত্র পড়লে, তারপর একটা ফুঁ দিয়ে পয়সাগুলো তার থলির মধ্যে পুরে ফেলে বললে—কেয়া কাম করতা?

বোকাদা বললে—চাকরি।

গণৎকার এবার পরিষ্কার বাংলায় বললে—আর করতে হবে না। তোমার হাতে যা লক্ষণ দেখছি তুমি রাজার জামাই হবে। অর্ধেক রাজত্ব আর এক রাজকন্যা পাবে।

বোকাদা উৎসুক হয়ে জানতে চাইলে—কবে পাব পণ্ডিতজী?

গণৎকার বললে—সময় হয়ে এসেছে। আর দেরি নেই। কিন্তু শুধু অদৃষ্টের ওপর নির্ভর করে থাকলেই হবে না। পুরুষকার চাই। আচ্ছা, কোনও রাজবাড়ির সঙ্গে জানা আছে?

বোকাদা বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ—শোভাবাজার রাজবাড়ি।

গণৎকার বললে,—উঁহু! 'শ' দিয়ে হলে হবে না।

বোকাদা বললে,—আছে, কাশিমবাজার রাজবাড়ি?

গণৎকার বিরক্ত হয়ে বললে,—ও রকম বাজারে বাজারে ঘুরলে হবে না।

বোকাদা বললে,—আচ্ছা পাইকপাড়া রাজবাড়ি?

গণৎকার বললে,—উঁহু! পাইক বরকন্দাজের পাড়ায় নয়। একেবারে খাস খানদানী রাজবাড়ি কিছু জানো?

বোকাদা অনেক ভেবে বলল—'সরাইকলা রাজবাড়ি আমার জানা। একবার 'ছৌ'নাচ দেখতে সেখানে গেছলুম।

গণৎকার বললে,—উঁহু! হবে না। সরায় সোনা থাকলে বরং হত। কলা থাকলে কলাটি পাবে! কোনও অঞ্জনগড় বা কাঞ্চনপুর এরকম কোনও জবর রাজবাড়ি জানা নেই?

বোকাদা এবার উৎসাহিত হয়ে বললে,—আজ্ঞে হ্যাঁ, পাহাড়পুরের রাজবাড়ি দেখে এসেছি।

গণৎকার বললে,—চমৎকার! ঐখানেই তোমার জন্যে সোনার পাহাড় তৈরি হয়ে আছে। তবে, তোমাকে একটু পরিশ্রম করতে হবে। নইলে হবে না। একবার যেমন করে হোক রাজকুমারীর সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া চাই। আমি এই মন্ত্রপড়া সিঁদুর দিচ্ছি—কপালে লাগিয়ে যাবে। তারপর রাজকুমারী তোমাকে দেখলেই ব্যস, কাজ হয়ে যাবে। রাজকুমারীর অনুরোধে রাজা তোমাকে ছাড়া আর কাউকে জামাই করবেন না। অর্ধেক রাজত্ব তোমার মারে কে?

বোকাদা তক্ষণি সিঁদুর নেবার জন্যে আগ্রহে হাত বাড়ালে। গণৎকার বললে,—উঁহু! মা কালীর পূজোর জন্যে পাচসিকে প্রণামী লাগবে। এ যে মন্ত্রপড়া সিঁদুর।

বোকাদা বললে,—আজ্ঞে, আজ তো আমার কাছে নেই। কাল এনে দিতে পারি।

গণৎকার একটু ভেবে বললে,—উঁহু! হলেও হবে না। মহেন্দ্রযোগ কেটে যাবে। আজ সন্ধ্যে অবধি শুভক্ষণ আছে। এর মধ্যে যদি পাঁচসিকে আনতে পারো—

বোকাদা করুণ কণ্ঠে বললে,—আজ্ঞে, সন্ধ্যে যে হয়ে এল। আমার বাড়ি এখান থেকে অনেক দূর। গিয়ে ফিরে আসতে রাত হয়ে যাবে যে!

গণৎকার কিছুক্ষণ চিন্তা করে বললেন,—তোমার আঙুলের ঐ আংটিটা কি সোনার?

বোকাদা বললে,—আজ্ঞে না, কেমিক্যাল গোল্ড!

—আচ্ছা, তোমার হাতের হাতঘড়িটা কত দিয়ে কিনেছিলে?

—আজ্ঞে এটাও কিনিনি। একটা লটারীতে পেয়েছিলুম। এক টাকার টিকিটে।

গণৎকার চিন্তিতভাবে বললেন,—তাইত! পাঁচ সিকেও নয়, একটাকা শুধু!

বোকাদা বললে,—আজ্ঞে, পাড়ার ঘড়িওয়ালাকে দেখিয়েছিলুম। সে বলেছে এর দাম আছে।

—দাম আছে? ওটা কি তবে রূপোর?

আজ্ঞে না,—নিকেল প্লেট!

গণৎকার হতাশ ভাবে বললে,—নাঃ, তোর বরাতে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা জুটলো না দেখছি। যত কেমিক্যাল আর নিকেল নিয়ে কারবার করিস! ওতে কি মায়ের পূজো হয়?

বোকাদা কাতর ভাবে বললে—এটা বেচলে পাঁচ সিকের ঢের বেশি পাওয়া যাবে পণ্ডিতজী, আপনি বিশ্বাস করুন।

পণ্ডিতজী বললেন,—তুই কালীর নামে আমার পা ছুঁয়ে শপথ কর যে রাজার জামাই হবার পর তুই ষোড়শোপচারে মায়ের পূজো দিবি।

বোকাদা পরম উৎসাহে বললে,—নিশ্চয় দেব, পণ্ডিতজী।

পণ্ডিতজী তখন নিতান্ত কৃপাপরবশ হয়ে বোকাদার হাতঘড়িটা নিয়ে, তার মাথায় তিনবার ঠেকিয়ে 'জয় গুরু! হরি ওঁ!' বলে নিজের ঝোলার মধ্যে পুরলেন। তারপর বোকাদার পেতে-রাখা হাতে মন্ত্রপড়া সিঁদুরের মোড়কটিতে একটি ফুঁ দিয়ে—আলগোছে টপ করে ফেলে দিলেন তার হাতে।

বোকাদার সর্বাঙ্গ যেন রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো।

ভক্তিভরে গণৎকারকে প্রণাম করে পায়ের ধুলো নিয়ে বোকাদা সেদিন খোঁড়াতে খোঁড়াতে বাড়ি ফিরলো। বাস ভাড়ার পয়সা গেছে পণ্ডিতজীর ঝুলিতে।

বাড়ি ফিরতে সুবুদ্ধিসুন্দরের দেরী হচ্ছে দেখে বাড়ির সবাই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়েছিল। বাস-ট্রামে আজকাল যে রকম দুর্ঘটনা ঘটছে, খোঁড়া ছেলেটার কি জানি কি হলো!

এমন সময় গলদঘর্ম হয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বোকাদা বাড়ি ঢুকলো।

চারিদিক থেকে প্রশ্নবাণ—কীরে? কী হয়েছিল? এত দেরী কেন?

বোকাদা হাঁ করে মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কোনও জবাব দিতে পারে

না। শেষে অনেক পীড়াপীড়ির পর বললে—আমি একবার পাহাড়পুরের রাজবাড়িতে যাবো।

—কেন রে! পাহাড়পুরে কেন? অফিসের কাজ বুঝি?

এমন সময় বোকাদার ছোটবোন আবিষ্কার করলে বোকাদার হাতে ঘড়ি নেই!

—কি রে? ঘড়ি কি হল? খুলে পড়ে যায়নি তো?

বোকাদা চুপ। জবাব দেয় না কিছু।

মা বললেন,—হ্যাঁরে, পাহাড়পুর যাবি বলছিস্—সে কবে?

বোকাদা গম্ভীরভাবে বললে,—আজই রাত্রে।

—কেন? অফিসের কি কোনও জরুরী কাজে তোকে পাঠাচ্ছে?

বোকাদা ঘাড় নেড়ে বললে,—না। শুভলগ্ন বয়ে যায়।

বোকাদার জবাব শুনে সবাই অবাক, ভয়ও পেয়ে গেল সবাই। ছেলেটার কি মাথা খারাপ হল!

তারপর নানা জিজ্ঞাসাবাদ ও জেরায় যখন গণৎকারের ভবিষ্যদ্‌বাণীর বিষয় জানা গেল তখন সবাই হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারে না। অনেক কষ্টে সবাই মিলে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে সে রাত্রের মতো বোকাদার পাহাড়পুরে যাওয়া বন্ধ করা হল।

পরের দিন ঘড়িটা উদ্ধার করবার আশায় পাড়ার ছেলেরা বোকাদাকে নিয়ে বড়বাজারে গিয়ে পগেয়াপটির ধারে কাছেও সে গণৎকারের টিকি দেখতে পেলে না।

তখন বোকাদাকে তারা বোঝালে যে সে একটা জোচ্চোরের পাল্লায় পড়েছিল। তার আংটিটা ভাগ্যিস কেমিক্যালের ছিল, তাই বেঁচে গেছে। কিন্তু ঘড়ি পাবার আর আশা নেই।

ঘড়ি ফেরত পাবার আশা অবশ্য বোকাদাও করে না। কেন না, মন্ত্রপূত সিঁদুরের পাঁচ সিকে দামের হিসেবে ঘড়িটা সে নিজেই দিয়েছে পণ্ডিতজীকে। কিন্তু, পাহাড়পুরের রাজার জামাই হবার আশা তার মন থেকে গেল না।

বোকাদা চেষ্টায় রইল, যদি সেই গণৎকারের একবার দেখা পায় কখনো তবে আর একটা শুভলগ্নের সন্ধান জেনে নেবে।

ছোটদের চিরকেলে গল্প

"এক যে রাজা—তাঁর ছিল দুই রাণী—দুয়ো রাণী আর সুয়ো রাণী···", এই বলে গল্প শুরু করতেন মা-ঠাকুমারা। ছোটরা তাঁদের ঘিরে বসতো। গল্প শোনার ঝোঁক তাদের চিরকেলে।

সভ্যতার আলো পৃথিবীর বুকে এসে পড়বার অনেক আগে থেকেই রূপকথার প্রচলন হয়েছিল প্রায় সব দেশেই। কত রকমের সে সব গল্প। রাজা-রাণী-রাজকন্যে, আবার রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্র সেনাপতিপুত্র কোটালপুত্র এই চার বন্ধুর দেশ-বিদেশে কত না দুঃসাহসিক অভিযান। কত রাক্ষস-খোক্কোস ভূত-পেত্নীর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ।

পাখীরাও আছে। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী, শুক-সারী, টুনটুনী, টিয়া, সবাই কথা বলে। কুমীর, হাঙর, কচ্ছপ, আর বড় বড় মাছও আছে। এরা সবাই বাচ্ছাদের বন্ধু। পশুরাজ তাদের আপনজন। সিংহী মামা—কেশর কাঁধে! ডোরাকাটা জামা গায়ে খুড়োমশাই বাঘ! হাতীপিসি, বেড়ালমাসি, ভোম্বল-দাদা ভাল্লুক, শেয়াল পণ্ডিত। আর, সেই ভুলোভাই কুকুর।

গল্পে ফুল ফলতে থাকতো। যেমন, সাতভাই চম্পার এক বোন পারুল।

আর সেই পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে তেপান্তর মাঠ পার হয়ে অচিন দেশের রাজকুমার চলে যেতেন কোন সুদূর দৈত্যপুরীতে। সেখানে বন্দিনী রাজকন্যা দৈত্যের মায়ায় অঘোর ঘুমে অচেতন। শিয়রে রাখা সোনার কাঠি রূপোর কাঠি ছুঁইয়ে রাজকুমারীকে জাগিয়ে তুলে দৈত্যপুরী থেকে বীরদর্পে উদ্ধার করা।

আরও কতো কাল্পনিক অলীক কাহিনী—যেমন চাঁদের দেশ, নক্ষত্র নগর, পরীদের পরীস্থান, সাতসাগরে গভীর অতলে প্রবাল দ্বীপ স্ফটিক প্রাসাদ, আকাশ ছোঁয়া পাহাড়চুড়োয় গন্ধর্ব কিন্নর অপ্সরাদের রাজ্য। কিন্তু গল্পের নায়কদের ছিল সর্বত্র অবাধ গতি!

গল্প যাঁরা বলতেন তাঁরা কত ছড়া আওড়াতেন। অনেক রকমের হেঁয়ালী আর ধাঁধাও থাকতো। গল্পের নায়কেরা অনায়াসে সঠিক সমাধান করে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যাকে জয় করে নিয়ে আসতো।

রূপকথা সব দেশেই প্রায় একরকম। যেমন আমি যে গল্পটি বলছি—এক পরীরাণীর দয়ার কাহিনী—এ গল্পও হয়ত অনেক দেশেই আছে।

এক দেশে কাঞ্চনপুর বলে একটি গ্রাম ছিল। সেখানে এক সওদাগর থাকতো। তার দুই বউ। বড় বৌয়ের একটি মেয়ে। নাম মৌরী। ছোট বৌয়েরও একটি মেয়ে। নাম গৌরী। মেয়ে দুটি একটু বড় হতেই সওদাগর গেল দূর বিদেশে বাণিজ্য করতে। কিন্তু নৌকোডুবি হয়ে সওদাগর মারা গেল। সঙ্গীরা তার মৃতদেহ বাড়ী নিয়ে এলো। ছোট বউ কেঁদে উঠে স্বামীর সঙ্গে এক চিতায় সহমরণে গেল। যাবার সময় মেয়েকে বড় বউয়ের হাতে সঁপে দিয়ে বলে গেল—গৌরীকে তুমি নিজের মেয়ের মতো দেখো দিদি।

কিন্তু বড় বউ তা' দেখেনি। হাজার হোক, সতীনের মেয়ে তো! সংসারের সব কাজ তিনি গৌরীকে দিয়েই করাতেন। নিজের মেয়েকে আদুরী ক'রে রেখেছিলেন। মৌরী তাই আয়েসী আর অহঙ্কারী হয়ে উঠেছিল। গৌরী মেয়েটি কিন্তু বেশ শান্ত, নম্র ও ধীর। আর দেখতেও খুব সুন্দরী। তার মিষ্টি স্বভাবের জন্য সবাই ভালবাসতো।

গৌরীকে রোজ আধক্রোশ দূরে গিয়ে নদী থেকে কলসী ভরে জল আনতে হোতো। ফিরতে একটু দেরী হলেই সৎমার কাছে বকুনি খেতো। মৌরীও ছোট বোনের সঙ্গে খুব খারাপ ব্যবহার করতো। গৌরীর মনে দুঃখ হোতো কিন্তু সে কিছু বলতো না। মুখ টিপে সব অত্যাচার সহ্য করতো। রাত্রে বিছানায় শুয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে মার জন্য কাঁদতো।

এখন হয়েছে কি, গৌরীদের গাঁয়ের ঠিক মাথার ওপরই নীল আকাশের কোলে এক পরীরাণীর রাজ্য ছিল। তিনি ওপর থেকে সব

দেখতেন। গৌরীর কষ্ট দেখে তাঁর মনে বড় কষ্ট হত। তিনি ঠিক করলেন এই মেয়েটিকে তিনি সুখী করবেন।

একদিন গৌরী নদী থেকে যখন জল নিয়ে ফিরছে, পরীরাণী এক ভিখিরী বুড়ী সেজে তার সামনে এসে বললেন—একটু তেষ্টার জল দেবে মা?

গৌরী তখনই কলসীটি হেলিয়ে ধরে বললে,—নিশ্চয় দেবো মা। মানুষকে তেষ্টার জল না দিলে অপরাধী হব যে।

বুড়ী আঁজলা পেতে জল খেতে খেতে এক কলসী জল সব নিঃশেষ ক'রে ফেললে। তারপর 'আঃ! বাঁচালে মা!' বলে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে গৌরীকে আশীর্বাদ করলে,—তুমি মা সুখী হবে। রাজরাণী হবে! প্রতি কথায় তোমার মুখ থেকে মুক্তা ঝরবে। তোমার হাসিতে হীরে মাণিক ঠিকরে পড়বে।' বলেই বুড়ী অদৃশ্য হয়ে গেল।

গৌরী আবার আধক্রোশ পথ ফিরে গিয়ে কলসীতে জল ভরে নিয়ে বাড়ী এল।

বাড়ী আসতে আজ তার বড্ড দেরী হওয়ায় সৎমা রেগে আগুন! তিনি যাচ্ছেতাই বকুনি দিয়ে বললেন,—মেরে তোর হাড় ভেঙ্গে দেব। কোথায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলি সত্যি করে বল।

গৌরী কখনো মিছে কথা বলে না। সে ফেরার পথে বুড়ীর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা সব বললে।

সৎমার দুই চোখ তখন কপালে উঠে গেছে! তিনি অবাক হয়ে দেখছিলেন গৌরীর প্রতি কথায় মুখ থেকে মুক্তো ঝরছে! তারপর সে যখন 'এক কলসী জল বুড়ি সব চোঁ চোঁ করে খেয়ে ফেললে!' বলতে গিয়ে একটু হেসে ফেলেছে; তার মুখ থেকে হীরে মাণিক ঠিক্‌রে পড়লো! দেখে ত সৎমা একেবারে থ'। একটু নরম হয়ে জানতে চাইলেন—এ সব কী কাণ্ড? এত হীরে-মুক্তো কোথা পেলি তুই?

গৌরী বললে—জল খেয়ে তৃপ্তি পেয়ে বুড়ি আমাকে এই আশীর্বাদ করে গেছে।

সৎমা আর কিছু না বলে হীরে-মুক্তোগুলো কুড়িয়ে আঁচলে বেঁধে নিয়ে চলে গেলেন।

তার পরদিন হুকুম দিলেন, আজ মৌরী জল আনতে যাবে। যাবার

সময় মেয়েকে শিখিয়ে দিলেন—পথে যদি কোনো বুড়ি তেষ্টায় জল চায়, দিস্, ভুলিস্নি।

ফেরার পথে বুড়ীর সঙ্গে মৌরীর দেখা হল। বুড়ী জল চাইলে কিন্তু মৌরী তার স্বভাবের দোষে তাকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলে। মার উপদেশ ভুলে গিয়ে তাকে জল দিলে না। বুড়ী তখন রেগে উঠে তাকে অভিসম্পাত দিয়ে গেল,—তোর প্রতি কথায় মুখ থেকে বিষাক্ত সাপ বেরুবে। তুই হাসলে মুখ থেকে কোলা ব্যাঙ্ ঠিক্‌রে পড়বে!

মৌরী বাড়ী ফিরতেই তার মা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করলেন,—হ্যাঁরে! পথে কি বুড়ীর সঙ্গে দেখা হয়েছিল?

মৌরী মুখ ভেঙচে বললে,—হ্যাঁ হ্যাঁ, ভিখিরী বুড়ী জল চাইতে আমি তাকে যাচ্ছেতাই অপমান করে হাঁকিয়ে দিয়েছি! ঈস্! ওঁর জন্যে এত কষ্ট করে নদী থেকে জল আনছি নাকি? এক তাড়া দিতেই বুড়ী পালাতে পথ পেল না! বুঝলে মা! বলেই মৌরী হেসে ফেললে।

মৌরীর মা তখন ভয়ে আঁৎকে উঠে চিৎকার করছেন—কে আছো বাঁচাও! ওরে বাপরে! এ যে কেউটে সাপ গোখরো সাপ কিলবিল করে বেরুচ্ছে মৌরীর মুখ থেকে! ওগো কী সর্বনাশ! আবার হাসতেই কোলা ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ছে ওর মুখ থেকে! ওমা কী হবে? আমার এ শক্রতা কে করলে?

সৎমার সব রাগ শেষে গিয়ে পড়লো গৌরীর ঘাড়ে।—ওর জন্যেই আমার এই বিপদ। দূর হ', দূর হ'! এখনি বাড়ী থেকে বিদেয় হ'! বলে তিনি ঝাঁটা মারতে মারতে গৌরীকে পথে বার করে দিলেন।

গৌরী বেচারা কাঁদতে কাঁদতে নদীর পারে বনের ধারে গিয়ে দাঁড়ালো। তখন সন্ধ্যে হয়-হয়। মনে মনে বলতে লাগলো,—হে ভগবান! বন থেকে যেন একটা বাঘ বেরিয়ে হালুম করে তাকে এখনি খেয়ে ফেলে!

কিন্তু বন থেকে বাঘের বদলে বেরিয়ে এলো ঘোড়ায় চড়ে এক সুদর্শন রাজকুমার! তিনি শিকার করে ফিরছিলেন। বনের ধারে একটি পরমা সুন্দরী মেয়েকে একলা দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখে ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—কাঁদছো কেন? কী হয়েছে তোমার?

সরল মেয়ে গৌরী অকপটে সব কথাই বললে। রাজকুমার তার কথা শুনতে শুনতে অবাক হয়ে দেখছিলেন—প্রতি কথায় গৌরীর মুখ থেকে মুক্তো ঝরছে!

তিনি বললেন,—তোমাকে আমার খুব চেনা লাগছে; তোমার নাম কি মুক্তেশ্বরী?

গৌরী কথা শুনে কান্নার মধ্যেও একটু হেসে ফেললে। বললে,—না না, আমি মুক্তেশ্বরী নই! আমার নাম গৌরী?

রাজকুমার এবার আরও আশ্চর্য হয়ে গেলেন দেখে যে মেয়েটি হাসবামাত্র তার মুখ থেকে হীরে-মাণিক ঠিক্‌রে পড়ছে! তিনি আর কোনও প্রশ্ন না ক'রে বললেন—তুমি দেখ্‌ছি অসাধারণ মেয়ে! সাক্ষাৎ লক্ষ্মী! তুমি চলো আমাদের বাড়ী। তোমায় খুব যত্ন করে রাখবো। কেমন? যাবে কি?

এই অচেনা ছেলেটিকে গৌরীর খুব ভাল লেগেছিল। ঘাড় নেড়ে জানালো—হ্যাঁ।

রাজকুমার খুব সাবধানে আদর করে গৌরীকে ঘোড়ার পিঠে চড়িয়ে রাজবাড়ীতে নিয়ে এলেন।

রাজা-রাণীরও গৌরীকে দেখে খুব ভাল লাগলো। মহা ধুমধাম করে তাঁরা রাজকুমারের সঙ্গে গৌরীর বিয়ে দিয়ে তাকে 'বৌরাণী' করে নিলেন।

গৌরীর এই সৌভাগ্যের খবর পেয়ে তার সৎমা আর সতাতো বোন মৌরী হিংসের জলে পুড়ে মলো!

আর গৌরী রাজবাড়ীতে সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর-সংসার করতে লাগলো। পরীরাণী তার ইচ্ছে পূর্ণ হ'ল দেখে খুশী হলেন।

"আমার কথাটি ফুরোলো।

নটে শাকটি মুড়োলো॥

কেনরে নটে মুড়োলি?

ছাগলে কেন খায়?—"

এমনিতর ছড়া ব'লে মা-ঠাকুমারা গল্প বলা শেষ করতেন।

নামে কিবা এসে যায়?

পুরাকালে তক্ষশীলা নগরে একজন সুবিখ্যাত শিক্ষাচার্য ছিলেন। তাঁর কাছে প্রায় পাঁচশো ব্রাহ্মণ ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করতেন। এই ছাত্রদের মধ্যে একজনের নাম ছিল 'পাপক'। অন্যান্য ছাত্রেরা তার এই পাপক নামটা নিয়ে তাকে খুব পরিহাস করত। দেখলেই বলত এই যে মূর্তিমান 'পাপক' এসে উপস্থিত। 'পাপক' এস, 'পাপক' বস, 'পাপক' ওঠো ইত্যাদি বলে, কারণে অকারণে তার 'পাপক' নামটা বারবার উচ্চারণ করে তাকে লজ্জা দিত।

পাপক সহপাঠীদের এ ব্যবহারে অত্যন্ত মর্মাহত হয়ে পড়ত। একদিন সে অনেকক্ষণ নিভৃতে বসে চিন্তা করে স্থির করে ফেললে যে সে তার 'পাপক' নামটা বদলে একটা কোনও ভালো নাম নেবে।

পরদিন আচার্যদেবের কাছে গিয়ে সে তার মনের দুঃখ জানিয়ে প্রার্থনা করলে যে তার এই খারাপ নামটি বদলে তিনি একটা ভালো নাম রাখুন।

আচার্য তাকে বললেন,—উত্তম কথা। তোমার 'পাপক' নাম বদলে আমি ভালো নাম রাখব, কিন্তু তার আগে তুমি সমগ্র তক্ষশীলা নগরী এবং তার আশেপাশের উপকণ্ঠ ঘুরে যতদূর পার লোকের নাম সংগ্রহ করে তার মধ্য থেকে কয়েকটি তোমার পছন্দমত ভালো নাম আমাকে জানাও। তুমি ফিরে এসে আমাকে জানালে তখন আমি তোমার একটি ভালো নাম দেব।

'যে আজ্ঞে গুরুদেব!' বলে পাপক সেইদিনই বেরিয়ে পড়ল শহর ঘুরে ভালো নাম সংগ্রহ করতে। ঘুরতে ঘুরতে নগরের এক অঞ্চলে সে এসে পড়ল। সেখানে এসে দেখে একটি লোকের মৃত্যু হয়েছে এবং তার আত্মীয়-স্বজনেরা মৃতের জন্য শোকপ্রকাশ করছে। পাপক জিজ্ঞাসা করলে,—যে ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তার কি নাম ছিল বলতে পারেন?

তারা বললে,—এঁর নাম ছিল 'জীবক'।

পাপক শুনে অবাক হয়ে গেল। ভাবলে, সে কি? যার নাম ছিল 'জীবক' তার কি করে মৃত্যু হ'ল? সে আবার জিজ্ঞাসা করলে,—আপনারা ঠিক জানেন? যাঁর নাম জীবক তাঁর কি মরণ হতে পারে?

তারা বললে,—নামে কি এসে যায় মশাই? 'জীবক' বা 'মৃত্যুঞ্জয়' বা 'আজীবক' যে নামই হোক না, মানুষ মাত্রেরই মৃত্যু অবধারিত। মরা বাঁচা কারুর নামের ওপর নির্ভর করে না। নাম তো আর কিছু নয়, শুধু লোকটি কে বা জিনিসটি কি বোঝাবার একটা উপায়। আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি দেখছি বড় কম।

এদের কথা শুনে পাপকের মনটা নিজের নাম সম্বন্ধে অনেকটা যেন হাল্‌কা হ'ল। নিজের নামের জন্য তার যে একটা বিরক্তি ও লজ্জাবোধ এসেছিল তা' বেশ খানিকটা কমে গেল।

পাপক সেখান থেকে ফিরে নগরের আর এক অঞ্চলে গিয়ে দেখে একজন ক্রীতদাসীকে তার প্রভু আর প্রভুপত্নী দু'জনে মিলে নির্দয়ভাবে প্রহার করছে। পাপক তাদের এই নিষ্ঠুর ব্যবহার দেখে ক্ষুণ্ণ হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—এ রমণী কী অন্যায় করেছে? একে আপনারা এমনভাবে মারছেন কেন? এর নাম কি?

তাঁরা বললেন,—এর নাম ধনপালী, এ আমাদের ক্রীতদাসী। এর সঙ্গে বন্দোবস্ত আছে রোজ মজুরি খেটে কিছু উপার্জন করে আনবে। সেই পয়সায় আমাদের এবং ওরও খাওয়া-পরা চলে। কিন্তু আজ এ কাজে ফাঁকি দিয়েছে। এক পয়সাও উপার্জন করে আনতে পারে নি। তাই একে আমরা শাসন করছি। নইলে এ রোজ না খেটেই খেতে চাইবে।

পাপক আবার বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলে,—আপনাদের যে ক্রীতদাসীর নামই হ'ল 'ধনপালী' তথাপি সে অর্থ আনতে পারে না, এও কি সম্ভব?

ধনপালীর প্রভু ও প্রভুপত্নী বললেন,—নাম এর ধনপালী বলেই কি ধন

আনবে কাঁড়ি কাঁড়ি! নামে কি এসে যায় মশাই? নাম তো শুধু কোনও মানুষ বা বস্তুকে নির্ণয় করবার উপায় মাত্র। আপনার দেখছি বেজায় মোটা বুদ্ধি!

পাপক লজ্জিত হয়ে সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেল। পথে যেতে যেতে ভাবতে লাগল, তাই তো! নামে কি এসে যায়? তার নাম 'পাপক' হলেও সে তো আর পাপী নয়। জীবনে কখনও পাপ কাজ করেনি। নিজের নাম সম্বন্ধে পাপকের মনটা অনেকটা শান্ত হ'ল।

সে তখন আশ্রমে ফিরছিল। এমন সময় দেখলে এক ভদ্রলোক ব্যাকুল হয়ে এপথ ওপথ ঘুরে বেড়াচ্ছে। পাপক তাকে জিজ্ঞাসা করলে,—আপনার কি কোনও বিপদ উপস্থিত হয়েছে? আপনাকে কি আমি কোনও সাহায্য করতে পারি?

ভদ্রলোক বললেন,—আমি পথ হারিয়ে ফেলেছি। নতুন লোক। কোন্ পথে বাড়ি ফিরব ঠিক সে পথটা চিনতে পারছিনে!

পাপক বললে,—আপনার নামটা জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?

ভদ্রলোক বললেন,—খুব পারেন। আমার নাম 'মহাপান্থক'!

পাপক নাম শুনে চমকে উঠল! বললে,—বলেন কি মশাই? যার নাম মহাপান্থক সে পথ হারিয়ে পথ খুঁজে পাচ্ছে না? এও কি কখনও সম্ভব?

ভদ্রলোক ম্লান হাসি হেসে বললেন,—নামে কি এসে যায় মশাই! আমি বিদেশী মানুষ এদেশের পথঘাট কেমন করে জানব? আপনার বুদ্ধি দেখছি বড়ই কম! আরে মশাই, নাম তো শুধু লোকটা কে বা জিনিসটা কি বোঝাবার জন্যই দেওয়া হয়। নামের কোনও দাম নেই।

এবার পাপকের মন থেকে তার নাম সম্বন্ধে সমস্ত বিরূপ মনোভাব দূর হয়ে গেল। সে নিশ্চিন্ত হয়ে আশ্রমে ফিরে এল। আচার্যদেবের পাদবন্দনা করতে এলে যখন তিনি জিজ্ঞাসা করলেন,—কেমন সব দেখে এলে আমায় বল? কী রকম ধরনের নাম তোমার বেশ পছন্দ হয়েছে আমাকে জানাও।

পাপক তখন আচার্যদেবের পদধূলি মস্তকে নিয়ে বললে,—গুরুদেব, যার নাম রাখা হয়েছিল জীবক, সেও মারা যায় দেখলুম। যার নাম ধনপালী, সে রমণীও দরিদ্র ও হতভাগ্য হয়। মহাপান্থক যার নাম, সে লোকও পথ হারিয়ে রাস্তা খুঁজে বেড়ায় দেখলুম। এঁরা সকলেই বললেন, নামে কি এসে যায়? নামের কোনও নিগূঢ় সারবত্তা নেই। নাম শুধু মানুষ ও বস্তু

নির্দেশের একটা উপায় মাত্র। নাম পরিবর্তন করলেই যে আমার কোনও পরিবর্তন হওয়া সম্ভব নয় এই জ্ঞান আমি আজ আপনার কৃপায় অর্জন করে এসেছি। সুতরাং আমার 'পাপক' নাম পরিবর্তন করে নেবার কোনও আগ্রহ নেই। আমার 'পাপক' নাম যা আছে তাই থাকুক।

আচার্যদেব তখন প্রীত হয়ে বললেন, তোমার সুবুদ্ধির উদয় হয়েছে দেখে আমি সবচেয়ে বেশি খুশি হলুম। যথার্থই নামের কোনও বিশেষ প্রভাব নেই মনের উপর। 'সত্যশরণ' যার নাম, সে লোকও অনেক সময় মিথ্যা বলে। আবার 'মিছে' যার নাম, সে হয়তো দেখবে ভুলেও কখনো মিছে কথা বলে না। সুতরাং···

আচার্যদেবের কথা শেষ হবার আগেই পাপক বললে,—সুতরাং পাপকই চিরদিন আপনার চরণ বন্দনা করবে।

বিব্রত ব্রতচারী

সন্ন্যাসী সুন্দরস্বামী বেরিয়েছেন পদব্রজে ভারতের নানা দিগ্‌দেশে তীর্থভ্রমণে। পথে যেতে যেতে কত গ্রাম, কত জনপদ, কত পল্লী ও নগর পার হয়ে তিনি এসে পড়লেন এক রাজার রাজ্যে। বিশাল তাঁর রাজধানী। পরিচ্ছন্ন পথঘাট। দু'ধারে আকাশচুম্বী সুদৃশ্য হর্ম্যরাজি। আলোকমালায় ও ধ্বজ-পতাকায় সুসজ্জিত নগরের রাজপথ ও প্রতিটি গৃহ। নৃত্য গীত বাদ্য ও উল্লাস কলরোল শোনা যাচ্ছে শহরের সর্বত্র। যেন উৎসব বেশে শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠেছে আজ রাজার সে রাজধানী।

একজন পথিক দ্রুত কোথায় চলেছিলেন যেন সেই নগরের আলোকোজ্জ্বল পথ দিয়ে। পরিধানে তাঁর মূল্যবান নূতন পরিচ্ছদ। হাতে ছিল তাঁর কি যেন নৈবেদ্যের মতো সাজানো একখানি মস্ত রজতপাত্র। সন্ন্যাসী তাঁকে সবিনয়ে আহ্বান করে বললেন, "জয় গুরু! মহাভাগ! আপনি এত ব্যস্ত হয়ে এমন বহুমূল্য উপহার নিয়ে কোথায় চলেছেন জানতে পারি কি? এ নগর আজ এত সুসজ্জিত কেন?"

পথিক সন্ন্যাসীর ডাক শুনে ক্ষণকাল দাঁড়ালেন। বিস্মিত হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকালেন। পিছু ডাকার জন্য তাঁর মুখে যে বিরক্তির ভাব ফুটে উঠেছিল সন্ন্যাসীর দিব্য জ্যোতির্ময় তরুণ সুন্দর সুকান্তি দর্শনে প্রীত হয়ে বললেন, "আপনি বোধহয় একজন পরদেশী তাই জানেন না যে এই রাজ্যের একমাত্র রাজকন্যা অনিন্দ্যসুন্দরী তিলোত্তমা আজ স্বয়ংবরা হবেন। নানা দিগ্‌দেশের নৃপতিরা এসেছেন, যুবরাজেরা এসেছেন, রাজকুমারেরা এসেছেন, দিগ্বিজয়ী বীর সেনাপতিরা এসেছেন, ধনী বণিকেরাও অনেকে এসেছেন।

আমাদের রাজকুমারীর রূপ-গুণের খ্যাতি দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছে। তাই উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সিংহল, পশ্চিমে দ্বারকা আর পূর্বে প্রাগ্-জ্যোতিষপুর—এই চারদিক থেকে কীর্তিমান পুরুষেরা এসেছেন ভাগ্য পরীক্ষার জন্য। কে জানে কার কণ্ঠে রাজনন্দিনী আজ মালা দেবেন?"

তরুণ সন্ন্যাসী সুন্দরস্বামী বললেন, "আপনার মুখে এই আনন্দ উৎসবের সংবাদ শুনে আমার বড়ো কৌতূহল হচ্ছে রাজকুমারীর স্বয়ংবর অনুষ্ঠান দর্শন করবার। কারণ, আমি এতদিন আশ্রমে নির্জনে কাটিয়েছি গুরু সন্নিধানে অধ্যাত্মতত্ত্ব অনুশীলনে। আমার ব্রহ্মচর্য তপস্যা সগৌরবে সমাপ্ত হবার পর শ্রীগুরুর আদেশে এখন তীর্থভ্রমণে বেরিয়েছি। দ্বাদশ বর্ষ পরে আমি আবার তপোবনে ফিরে যাব। স্বয়ংবর সভায় কি বিদেশী দর্শকের প্রবেশাধিকার আছে?"

পথিক বললেন, "বিলক্ষণ। আজ ধনী-দরিদ্র দীন-দুঃখী সামান্য-অসামান্য সবার কাছে রাজপ্রাসাদের দ্বার অবারিত। রাজকুমারীর স্বয়ংবর সন্দর্শনে রাজ্যের সকলেই সেখানে আমন্ত্রিত। আশঙ্কা করি, ইতিমধ্যেই স্বয়ংবর-সভা হয়তো লোকে লোকারণ্য হয়ে উঠেছে। আমার বিলম্ব হয়ে গেল রাজকুমারীর জন্য এই উপঢৌকন সংগ্রহ করে আনতে। নগরের কোনও বিপণিতে আর উপহার দেবার মতো কোনও সামগ্রীই অবশিষ্ট নেই। প্রজারা যে যার সাধ্যমত সব কিনে নিয়ে তাদের পরমপ্রিয় রাজকন্যার স্বয়ংবর উপলক্ষে তাঁকে উপহার দেবার জন্য রাজসভার দিকে ছুটছে। আপনি যেতে চান তো শীঘ্র আমার অনুসরণ করুন।"

তরুণ সন্ন্যাসী সুন্দরস্বামী একটু কুণ্ঠিত হয়ে বললেন, "কিন্তু আমি তো কোনও উপহার সঙ্গে আনি নি। এই শ্রীভগবানের নামজপের স্ফটিক মালাটি ভিন্ন আমার সঙ্গে আর কিছুই নেই।"

পথিক বললেন, "ওই স্ফটিক মালাটিই আপনি উপহার দেবেন। তা হলেই হবে। দানের মধ্যে দেবার আন্তরিক আগ্রহটাই বড়ো, মূল্য বিচারের ওপর উপহারের মর্যাদা নির্ভর করে না।"

পথিকের মুখে এই কথা শুনে সন্ন্যাসী সুন্দরস্বামীর চৈতন্য হল। তাই তো! তাঁরও হাতে রয়েছে তো এক বহুমূল্য দ্রব্য! কিন্তু এ মালা তো আমি কাউকে দিতে পারবো না। এ যে আমার গুরুদত্ত দীক্ষার পবিত্র দান। এই মালার সঙ্গেই যে তিনি আমায় ইষ্টমন্ত্র দিয়েছেন যা আমাকে অহোরাত্র প্রতিক্ষণে জপ

করতে হয়। —"না না! পথিক বন্ধু, এ মালা আমি কাউকে দিতে পারব না।"

সন্ন্যাসী সুন্দরস্বামীর এই কাতরোক্তি শুনে পথিক যেন চমকে উঠে বললেন, "ওহো! ক্ষমা করবেন আমাকে। আমি ভুলে গেছলুম। সন্ন্যাসীর দান সংসারীর গ্রহণীয় নয়। আপনি রিক্ত হাতেই আসুন আমার সঙ্গে। আপনার শুভ ইচ্ছা ও স্নেহাশীর্বাদই যথেষ্ট।"

পথিক যখন সন্ন্যাসীকে নিয়ে রাজপ্রাসাদে পৌঁছলেন, স্বয়ংবর-সভা তখন লোকে লোকারণ্য। রাজকুমারীর পাণিপ্রার্থী রাজন্যবর্গের চেয়ে দর্শনার্থীর ভিড়ই বেশি। পথিক সেই ভিড়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে গেলেন। কিন্তু তেজঃপুঞ্জ কলেবর এই রূপবান তরুণ সন্ন্যাসীকে দেখে সবাই সসম্ভ্রমে সরে সরে তাঁকে পথ ছেড়ে দিলে। তার ফলে সুন্দরস্বামী একেবারে স্বয়ংবরে সমাগত ভাগ্যপরীক্ষার্থী রাজন্যবর্গের যে দীর্ঘ শ্রেণী হয়েছিল তারই শেষ প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াবার সুযোগ পেলেন। সেখান থেকে সমস্ত রাজসভার দৃশ্য বেশ সুস্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল।

অকস্মাৎ শঙ্খ ঘণ্টা তুরী ভেরীর সঙ্গে উৎসব ঘোষণা করে ঢাক ঢোল বেজে উঠল। সবার কণ্ঠে ফিসফিস করে শোনা যেতে লাগল—ওই। ওই যে আসছেন। বরমাল্য হাতে স্বয়ংবরা বধূরূপে রাজকুমারী তিলোত্তমা। সঙ্গে তাঁর চন্দন তিলক ও পঞ্চামৃতের অর্ঘ্যপাত্র নিয়ে একাধিক সহচরী রাজকন্যার অনুসরণ করছেন।

আহা হা! কী রূপ রাজকুমারীর! যেন ষড়ৈশ্বর্যশালিনী জননী জগন্মোহিনী! রাজন্যবৃন্দ সকলে রাজকন্যাকে সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানাচ্ছেন দেখে সন্ন্যাসী সুন্দরস্বামীও 'হরি ওঁ! ভবতু শুভায়!' ব'লে আশীর্বচন উচ্চারণ করলেন।

রাজকুমারী সবিনয়ে সকলকে প্রতিনমস্কার জানিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। সভাচার্য প্রত্যেক পাণিপ্রার্থীর পরিচয় দিতে লাগলেন। ইনি মহারাজকুমার শ্রীশ্রীইন্দ্রজিৎ। অমিততেজা ধনুর্ধর, ইনি মহাবীর মহেন্দ্র রায় মহীপতি। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছেন রাজন্যবর্গ। কারণ প্রত্যেকের পরিচয় শোনার পরও রাজকন্যা একে একে সকল পাণিপ্রার্থীদেরই অতিক্রম করে এগিয়ে চলেছিলেন। রাজভট্ট উচ্চকণ্ঠে কীর্তিকাহিনী ঘোষণা করছিলেন একে একে স্বয়ংবর-সভায় সমাগত প্রত্যেক বরমাল্যকামীর।

সমবেত প্রার্থিগণের দীর্ঘ পঙ্‌ক্তি শেষ হয়ে এলো প্রায়। রাজকন্যা কারুর কণ্ঠেই বরমাল্য দিতে পারলেন না।

এমন সময় তাঁর দৃষ্টি পড়ল একেবারে শেষপ্রান্তে কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টি নিয়ে দণ্ডায়মান এক জ্যোতির্ময়তনু পরমসুন্দর সন্ন্যাসী। তাঁর চোখে চোখ পড়তেই কী জানি কি হলো রাজকুমারীর। সভাচার্য ও রাজভট্ট কেউই তাঁর পরিচয় দিলেন না। তবু তিনি পরম আগ্রহে সেই অজ্ঞাত ব্রহ্মচারী যতির কণ্ঠে তাঁর বহুমূল্য বরমাল্য পরিয়ে স্বয়ং নির্বাচিত পতির পদমূলে মাথা নত করে যখন প্রণাম করতে উদ্যত—রাজসভার বিলাস-বৈভবমুগ্ধ সন্ন্যাসী সুন্দরস্বামী যেন এতক্ষণে সচকিত ও সজাগ হয়ে উঠলেন। ত্বরিতবেগে পা সরিয়ে নিয়ে বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "না না! একি করলে রাজকুমারী? আমি একজন ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী। কৌতূহলের বশে স্বয়ংবর-সভা অবলোকন করতে এসেছি এখানে। নারীর স্পর্শ পর্যন্ত আমাদের মতো ত্যাগব্রতীদের পক্ষে নিষেধ। পাণিগ্রহণ তো দূরের কথা!" বলতে বলতে সন্ন্যাসী তাঁর কণ্ঠ থেকে রাজকন্যার প্রদত্ত বরমাল্য দু'হাতে টেনে ছিঁড়ে স্বয়ংবর-সভাতলে ঘৃণার সঙ্গে নিক্ষেপ করে, ছুটে সেখান থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন।

হাহাঃ হাহাঃ হাঃ! হাসির হর্‌রা উঠলো!

স্বয়ংবর-সভায় সমবেত রাজন্যবর্গ, যাঁরা রাজকুমারীর দ্বারা উপেক্ষিত হয়েছিলেন তাঁরা উচ্চহাস্যে রাজকুমারীকে টিট্‌কিরি দিয়ে একে একে সভা ত্যাগ করে চলে গেলেন।

মহারাজ অপমানিতা কন্যার এই দুরবস্থা দেখে অত্যন্ত লজ্জিত ও মর্মাহত হলেন। কন্যাকে আদর করে বুকে টেনে নিয়ে বললেন, "দুঃখ করিস্ নি মা! ভুল করে তুই সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারীর কণ্ঠে বরমাল্য দিয়েছিলি। আমি আবার তোর স্বয়ংবর-সভার আয়োজন করব। কোনও ভয় নেই মা!"

রাজকন্যা অশ্রুসজল নেত্রে বললেন, "আমায় ক্ষমা করুন পিতা। আমি যাঁর কণ্ঠে বরমাল্য দিয়ে পতিত্বে বরণ করেছি তিনিই আমার স্বামী। তিনি 'সন্ন্যাসী'ই হোন বা 'যতি'ই হোন অথবা 'ব্রহ্মচারী'ই হোন আমি আজ থেকে তাঁরই সহধর্মিণী। আমায় বিদায় দিন পিতা। আমি আমার স্বেচ্ছাকৃত সন্ন্যাসী পতির অনুগমন করি।"

এই বলে রাজকুমারী তিলোত্তমা সেই স্বয়ংবর উৎসবে সুসজ্জিত নববধূর

বেশেই সভাগৃহ ত্যাগ করে সন্ন্যাসী সুন্দরস্বামীর অনুসরণে দ্রুতপদে ছুটে গেলেন।

সন্ন্যাসী রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে বেশি দূর থেকে পারেন নি তখনও। রাজকুমারী তাঁকে পথে দেখতে পেয়ে নিঃশব্দে তাঁর পশ্চাদনুসরণ করে চললেন।

সন্ন্যাসী সুন্দরস্বামীকে পথ চলার সময় অত্যন্ত যেন চিন্তিত মনে হচ্ছিল। তিনি পথের কোনও দিকে দৃষ্টিপাত না করে সম্মুখেই চলেছিলেন। তাঁর মনে কেবলই এই ভাবনাটিই বড়ো হয়ে উঠছিল যে তাঁর এই কাজটা ন্যায়সংগত ও ধর্মানুমোদিত হয়েছে কি না? কিছুই স্থির সিদ্ধান্ত করতে না পেরে তিনি আর তীর্থভ্রমণে অগ্রসর না হয়ে ফিরে চললেন তাঁর সেই অরণ্য-আশ্রমে গুরুদেবের সন্নিকটে। তাঁকেই গিয়ে জিজ্ঞাসা করবেন কাজটা তাঁর ধর্মসংগত হয়েছে কিনা। অনুপম রূপসী রাজকন্যার সেই অনিন্দ্যসুন্দর দেবী-প্রতিমার মতো উজ্জ্বল মুখখানি বার বার তাঁর মনে পড়ছিল। ক্রোধে ক্ষিপ্ত হয়ে যখন তিনি রাজকন্যার দেওয়া বরমাল্য কণ্ঠ হতে ছিন্ন করে স্বয়ংবর-সভাতলে নিক্ষেপ করেছিলেন চকিতের ন্যায় একবার রাজকুমারীর মুখের দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়েছিল। মনে হয়েছিল সে মুখ যেন সহসা সূর্যাস্তের কমলিনীর মতো বিবর্ণ ও ম্লান হয়ে পড়েছে। বার বার নিজেকে তাঁর অপরাধী বলে মনে হচ্ছিল। মনের মধ্যে একটা অনুতাপ এবং অনুশোচনাও হচ্ছিল। কেন তিনি কৌতূহলের বশে সন্ন্যাসী হয়েও স্বয়ংবর-সভায় এসে উপস্থিত হয়েছিলেন?

গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করতে চলেছেন তিনি—এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত কী?

পিছু পিছু চলেছেন রাজকুমারী স্বয়ংবরা বধূবেশে। চরণের নূপুর তাঁর প্রতি পদক্ষেপে রুনুঝুনু করে বেজে উঠছে না; কারণ পথের মাঝে তিনি তাঁর স্বর্ণ মঞ্জীর পা থেকে খুলে ফেলে দিয়েছিলেন। তাঁর অঙ্গের অলংকার-সিঞ্চনও বসন শাসনে সংযত করে নিয়ে চলেছিলেন স্বনির্বাচিত পতির চলার পথের ছন্দানুবর্তিনী হয়ে।

দীর্ঘ পথ। এতটা দূর পায়ে হাঁটা অভ্যাস নেই রাজকন্যার। ক্লান্তিবোধ করছেন তিনি। ললাটে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। অরণ্যগামী কঙ্করময় পথে কোমল চরণ তাঁর প্রতিপদে ব্যথা পাচ্ছে। তবু তিনি চলেছেন মনে মনে স্মরণ করে পতি শ্রীরামচন্দ্রের অনুগামিনী রাজর্ষি জনকের কন্যা অযোধ্যার রাজকুলবধূ সীতার কথা।

অরণ্যের নিবিড় নির্জন শান্তিময় পরিবেশের মধ্যে একটি ছবির মতো

আশ্রম। তরুলতা ও পুষ্পপুঞ্জে-ঘেরা মনোরম সে পরিবেশ! বনবীথী অতিক্রম করে সাধু সুন্দরস্বামী একান্ত বিপন্নের মতো ত্বরিতপদে গিয়ে গুরুদেবের চরণে মাথা লুটিয়ে পড়লেন। যেন তিনি মস্ত বড়ো কী একটা অপরাধ করে এসেছেন।

গুরুদেব এত শীঘ্র সুন্দরকে তীর্থভ্রমণ শেষ করে ফিরে আসতে দেখে বিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, "বৎস! তুমি কি যোগবলে এত অল্প সময়ের মধ্যে ভারতের সকল তীর্থ দর্শন করে ফিরে এলে?"

সন্ন্যাসী সুন্দরস্বামী কাতরকণ্ঠে বললেন, "আমি আপনার চরণে আজ অপরাধী হয়ে ফিরে এসেছি। তীর্থদর্শন আমার ভাগ্যে এখনও সম্পন্ন হয়নি। পথিমধ্যে এক রাজ্যে রাজকুমারী স্বয়ংবরা হচ্ছেন শুনে কৌতূহলবশে আমি একজন দর্শকরূপেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলুম। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রাজকন্যা স্বয়ংবর-সভায় উপস্থিত সমস্ত জ্ঞানী গুণী বরেণ্য বীরগণকে উপেক্ষা করে সভার এক কোণে দণ্ডায়মান এই ব্রহ্মচারীর কণ্ঠে বরমাল্য দিলেন।"

গুরুদেব মৃদুহাস্য করে বললেন, "উত্তম! তারপর? তুমি কি করলে?"

"আমি রাজকুমারীর এই অপ্রত্যাশিত আচরণে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে ভর্ৎসনা করে তাঁর দেওয়া বরমাল্য কণ্ঠ থেকে ছিঁড়ে ফেলে দিয়ে ছুটে চলে এসেছি আপনার কাছে উপদেশ নিতে এখন আমার কি করা কর্তব্য? কাজটা আমার উচিত হয়েছে না অনুচিত হয়েছে? যদি অপরাধ হয়ে থাকে কী প্রায়শ্চিত্ত করলে তা ক্ষালন হবে আমাকে আদেশ করুন।"

গুরুদেব সুন্দরের মাথায় সস্নেহে হাত বুলিয়ে প্রসন্নকণ্ঠে বললেন, "বৎস! বরমাল্য ছিন্ন করে ফেলে দিলেই বিবাহবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। কৌতূহলের বশেই হোক আর যে কারণেই হোক স্বয়ংবর-সভায় যখন প্রতিযোগী রাজন্যবর্গের সঙ্গে একই শ্রেণীতে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলে, তখন তুমিও স্বয়ংবর-বিধি অনুসারে রাজকন্যার পাণিপ্রার্থী একজন পাত্র হিসাবেই পরিগণিত হতে বাধ্য। রাজকুমারীর অর্পিত বরমাল্য কণ্ঠ হতে ছিন্ন করে স্বয়ংবর-সভায় ফেলে দিয়ে পালিয়ে আসায় তুমি দ্বিগুণ অপরাধে দোষী হয়েছ! তুমি এখনি সে রাজ্যে ফিরে যাও। রাজা ও রাজকন্যার কাছে তোমার উদ্ধত অবিনয়ী কার্যের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করে রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করো গে, তবেই তোমার এই অন্যায় অপরাধের কথঞ্চিৎ প্রায়শ্চিত্ত হবে।"

সাধু সুন্দরস্বামী করুণ সজল চক্ষে বললেন, "প্রভু! আমি যে সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারী—দারপরিগ্রহ তো আমার পক্ষে শাস্ত্রমতে নিষেধ।"

গুরুদেব প্রফুল্ল পরিহাসের কণ্ঠে বললেন, "বৎস! শাস্ত্রশিক্ষা দেখছি তোমার সম্পূর্ণ হয়নি এখনও। তোমাকে চতুর্বেদাশ্রমের কথা বলেছিলুম স্মরণ নেই? প্রথমে 'ব্রহ্মচর্য', তারপর 'গার্হস্থ্য, তারপর 'বানপ্রস্থ', তারপর 'সন্ন্যাস'। যাও তুমি ফিরে গিয়ে রাজকন্যাকে বিবাহ করে গার্হস্থ্য ধর্ম পালন করো গে—"

গুরুদেবের কথা শেষ হবার আগেই রাজকুমারী ছুটে এসে তাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়লেন। আর্তকণ্ঠে বললেন, "প্রভু! আমি সেই হতভাগিনী! ক্ষণপূর্বে রাজকন্যাই ছিলুম কিন্তু স্বেচ্ছায় সন্ন্যাসীকে পতিত্বে বরণ করে আমি আজ সৌভাগ্যবতী! আশীর্বাদ করুন আমি যেন তাঁর উপযুক্ত সহধর্মিনী হয়ে এই আশ্রমেই তাপসী উমার মতো আমার শিবতুল্য স্বামীর সেবা করতে পা'র।"

গুরুদেব মহানন্দে রাজকন্যাকে বললেন, "তথাস্তু! তোমরা সুখী হও। তোমাদের দাম্পত্য জীবন সার্থক হোক!"

চোরে চোরে মাসতুতো ভাই

কথাটা আমরা প্রায়ই লোককে বলতে শুনি: শুনে এইটুকুই হয়তো বুঝতে পারি যে তারা দুই ভাইই চোর, কিন্তু তারা সহোদর ভাই না হয়ে মাসতুতো ভাই হল কেন? এর সঠিক খবর জানতে হলে এই গল্পটা শুনে রাখা চাই।

একবার চারটে চোর দল বেঁধে অমাবস্যার ঘুটঘুটে রাত্রে চুরি করতে যায় এক গৃহস্থের বাড়ি। গৃহস্থেরা রাত্রে কেউ বাড়ি ছিল না। চোরেরা তাদের যথাসর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যখন বাড়ি থেকে বেরুচ্ছে দেখে রাত আর নেই। ভোরের আলো দেখা দিয়েছে। তারা তখন মহা মুশকিলে পড়লো। এত থালা, বাসন, ঘটি, বাটি, ঘড়া, গাড়ু, সকালবেলা নিয়ে যাবে কেমন করে রাস্তা দিয়ে, লোকে দেখতে পেলে যে ধরা পড়ে যেতে হবে। হায় হায়, এখন কি উপায়?

সেই চারজনের মধ্যে একজন ছিল একটু চালাক-চতুর চোর। সে বললে, —এক কাজ করা যাক আয়। মাথায় একটা ভারি বুদ্ধি এসেছে। ঐ যে উঠোনে একখানা দড়ি-ছেঁড়া খাটিয়া পড়ে রয়েছে, এই খাটিয়া খানায় সব চোরাই মাল একখানা মাদুর বিছিয়ে সাজিয়ে রাখ, তারপর একখানা চাদর চাপা দিয়ে চল আমরা চারজনে কাঁধে করে নিয়ে যাই 'বল হরি হরি বোল' বলতে বলতে, যেন কোনও মৃত আত্মীয়কে শ্মশানে নিয়ে যাচ্ছি—এমনি ভাবে আর কি, তাহলে আর কেউ কিছু সন্দেহ করবে না।

শুনে বাকি তিনজন আনন্দে লাফিয়ে উঠলো—ইঃ, তোর কি বুদ্ধি মাইরি! ঠিক বলেছিস, চল্, তাই করি।

সঙ্গে সঙ্গে তারা মহা উৎসাহে সমস্ত জিনিসই খাটিয়ায় সাজিয়ে চাদর চাপা দিয়ে বেরিয়ে পড়লো রাস্তায় 'বল হরি হরি বোল' বলতে বলতে।

পথে যে কেউ তাদের দেখে জিজ্ঞাসা করে—আহা, কে মারা গেল হে?

তারা কাঁদো কাঁদো হয়ে বলে—আজ্ঞে, মেসোমশাই!

এখন হয়েছে কি, একটা পাকা চোর সেই সময় সেই পথেই আসছিল লোকের ক্ষেতের লাউটা বেগুনটা কলাটা মুলোটা চুরি করে নিয়ে যাবার চেষ্টায়। ওদের দেখে তার কেমন সন্দেহ হ'ল যে এরা শ্মশানে শব নিয়ে যাচ্ছে মাত্র চারটি লোক! শ্মশান ঘাট তো এখান থেকে অনেক দূর! সে একটু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে খাটিয়ার দিকে লক্ষ্য করতেই দেখলে যে ঢাকা চাদরের একপাশ থেকে পেতলের গাড়ুর মুখনলটা বেরিয়ে পড়েছে। সে তখন তাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে চাপা গলায় বললে—মেসোর গাড়ুর নল দেখা যায়!

চোরেরা বুঝতে পারলে এ-ও এক ওস্তাদ। তাড়াতাড়ি চাদরটা আর একটু টেনে নলটা চাপা দিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বললে,—ভাগ নেবে তো সঙ্গে এস।

পাকা চোর তখনি এগিয়ে গিয়ে খাটিয়ায় কাঁধ দিয়ে বলে উঠলো,—এ সর্বনাশ কার হ'ল? মেসো আমার কবে গেল?

সেই থেকেই এ দেশে 'চোরে চোরে মাসতুতো ভাই' প্রবাদ চলে আসছে।

প্রবন্ধ

তোমাদের মত বয়সে আমি

ছেলেবেলার দুষ্টুমীর গল্প শুনতে চেয়েছো, কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে ছেলেবেলায় আমি দুষ্টু ছিলাম না মোটেই। ফলে অন্য দুষ্টু ছেলেদের দ্বারা নির্যাতিত হয়েছি বারবার।

মনে পড়ে একদিনের ঘটনা। বয়স তখন ১২।১৩ বছর হবে। এনট্রান্সস্কুলের প্রেপারেটরি ক্লাশে, অর্থাৎ সে আমলে সেকেণ্ড ক্লাশে পড়ি।

সেদিন ছিল শনিবার। সকাল ক'রে স্কুল থেকে ফিরেছি। আমাদের বাড়ীব প্রশস্ত প্রাঙ্গণে পাড়ার সমবয়সী ছেলেরা এসে জড় হয়েছে। রোজই আসে তারা। আমাদের উঠোনেই খেলা করি সবাই মিলে। আমাদের বাড়ী চক-মিলানো দালান ও খুব বড় উঠান ছিল। সব রকম খেলার সুবিধে পাওয়া যেত।

আমার বেশ মনে আছে, আমাদের মধ্যে তখন ফুটবল খেলার তেমন রেওয়াজ হয়নি। আমরা তখন ক্রিকেটের খুব ভক্ত। মার্বেল গুলি, ডাণ্ডা গুলি, কপাটি, চোর-চোর প্রভৃতি দেশী খেলাগুলো তখন জোর চলতো। ঘুড়ি ওড়ানো আর লাট্টু ঘোরনো ছিল আমাদের মস্ত নেশা।

স্কুলেও এসব খেলাই আমরা চালাতুম—সাড়ে দশটার আগে আর দেড়টার টিফিনে। চারটের পর অবশ্য আর এক মিনিটও স্কুলে নয়! সোজা বাড়ী। কারণ আজ বাড়ীতে কি খেলা হবে আগের দিনই প্রায় সেটা ঠিক হয়ে থাকতো।

আমাদের উঠোনে সেদিন কপাটি খেলা চলছিল। 'কাঁইচি' মারা প্যাঁচটায় আমি খুব অভ্যস্ত ছিলুম বলে যে দলে যেতুম সে দল প্রায়ই খেলায় জিততো।

সেদিন একদলে ছিলুম আমি, আমার ছোট ভাই এবং চাটুজ্যে বাড়ীর বড় ছেলে। বিপক্ষ দলে ছিল মিত্তির বাড়ীর দুই ভাই আর চাটুজ্যে বাড়ীর ছোট ছেলে। আমরা ৬ জনে ছিলুম বিশেষ অন্তরঙ্গ।

খেলায় আমরা জিতলুম বটে, কিন্তু মিত্তির বাড়ীর বড় ছেলে একটু জখম হয়ে গেল। কপাটি খেলায় এ হয়েই থাকে। বিশেষ হঠাৎ 'কাঁইচি' খেয়ে সামলানো বড় একটা কারুর সাধ্যে কুলায় না। আমার নিজেরই ত' ডান হাতের কনুইটা আজও ভেঙ্গে আছে, এই কপাটি খেলার কৃপায় কাঁইচির প্যাঁচ শিখতে দাম দিতে হয়েছিল।

মিত্তির বাড়ীর বড় ছেলে জখম! সোজা ব্যাপার নয়। বডলোকের বাড়ীর আদুরে ছেলে! বাবার কাছে এলো অভিযোগ। বাবার বন্ধুর ছেলে। নিজের ছেলের চেয়ে বেশী ভালবাসতেন ওদের, বিচারে আমার অপরাধ প্রমাণ হয়ে গেল। আমিই নাকি 'কাঁইচি' মেরে ফেলে দেওয়ার ফলে তার মাথা রগ ঘেঁসে ফেটে গেছে!

বাবা বললেন—তোমার মত গুণ্ডা ছেলেকে আমি বাড়ীতে রাখতে চাই না। বেরিয়ে যাও বাড়ী থেকে। খবরদার আর আমার বাড়ী ঢুকো না।

কেমন একটা দুর্জয় অভিমান শিঙ বেঁকিয়ে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো মনের ভিতর। খেলতে গিয়ে লেগেছে। আমি ত' ইচ্ছে করে মারিনি। তবু এত বড় শাস্তি?

থাকবো না এই বাড়ীতে। রাখবো না এ প্রাণ। গঙ্গায় ডুবে মরবো এই সঙ্কল্প নিয়েই বেরিয়ে গেলুম বাড়ী থেকে তৎক্ষণাৎ।

কিন্তু মুস্কিল হল রাস্তা চিনিনি মোটে। আজকালকার ছেলেরা শুনে হয়ত হাসবে। কিন্তু বিশ্বাস করো আমাদের ছেলেবেলায় একলা রাস্তায় বেরুবার হুকুম ছিল না।

১২।১৩ বছর বয়সেও চাকরের সঙ্গে ইস্কুলে গেছি, দারওয়ানের সঙ্গে ফিরেছি। কাজেই বাড়ী থেকে স্কুল আর স্কুল থেকে বাড়ী এই পথটুকুই ছিল চেনা। তাই বা কতটুকু। আমাদের বাড়ী থেকে স্কুল পাঁচ মিনিটের রাস্তা।

মা জ্যাঠাইমার সঙ্গে পালা-পার্বণে গঙ্গাস্নান করতে যেতুম বটে। কিন্তু সেত ন'মাসে ছ'মাসে। কবে বারুণী, কবে জন্মাষ্টমী, কবে সেই মকর-সংক্রান্তি আর শিব-চতুর্দশী! তাও কি সব বারে যাবার সুযোগ পেতুম? একটু নাকি সর্দি থাকলে বাড়ীর স্নানই বন্ধ—তা গঙ্গাস্নান! তার ওপর যেতে হত দোর-জানালা বন্ধ গাড়ীতে। কাজেই গঙ্গার ঘাটের পথটাও ভাল জানা ছিল না। শুধু মনে ছিল গাড়ী বাড়ী থেকে বেরিয়ে সোজা পশ্চিম মুখে ছুটতো।

আমিও পশ্চিম-মুখো পথ ধরে চলতে শুরু করলাম। তখন সন্ধ্যে হয়-হয়।

খানিকদূর যেতে না যেতেই রাস্তায় গ্যাস জ্বলতে দেখলুম। দু'একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে পৌছুলুম ঠিক। আমাদের বাড়ী থেকে বেশী দূর নয়।

সেদিন কি ছিল মনে নেই। গঙ্গায় দেখি সব সিঁড়ি ডুবে গিয়ে জল থৈ-থৈ করছে। গঙ্গার সে বিশাল মূর্তি দেখে ভয় পেলুম। গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে ডুবে মরবার সংকল্প নিমেষে উবে গেল।

অনেক রাত পর্যন্ত গঙ্গার ধারেই বসে রইলুম। ক্ষিধে পাচ্ছে, ঘুম পাচ্ছে। কিন্তু বাড়ী ফিরবো না—প্রতিজ্ঞা।

শেষে গঙ্গার ঘাট জনমানব শূন্য হয়ে গেল। আর সেখানে থাকতে সাহস হ'ল না।

ফিরলুম শহরের দিকে। একটা রাস্তার কলে মুখ দিয়ে একপেট জল খেয়ে নিলুম। ক্ষুধা কমলো, কিন্তু ঘুমের অবসন্নতা জয় করি কিসে?

হঠাৎ চোখে পড়লো রাস্তার ধারে একটি বাড়ীর চওড়া রকে মুটে মজুর আর ভিখিরীরা শুয়ে পরম আনন্দে নিদ্রা যাচ্ছে। ভাবলুম মন্দ কি? আমিও তো এদের রকের ওই খালি দিকটায় শুয়ে ঘুমুতে পারি।

একথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পা যেন আর চলতে চায় না। উঠে পড়লুম রকে। একপাশে শুয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অগাধ ঘুম। মাঝ রাত্রে একবার চোখ চেয়ে দেখি একটা গুণ্ডা গোছের লোক আর জায়গা না পেয়ে আমায় ঠেলে সরিয়ে দিয়ে সেই রকে জায়গা করে নিয়ে শুয়ে পড়লো। ভয়ে আর সারা রাত ঘুমুতে পারলুম না। চোখ বুজে মটকা মেরে মড়ার মতো পড়ে রইলুম। ক্ষিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে।

ভোর হতে না হতে উঠে পড়লুম। পাশের লোকটা তখনও ঘুমুচ্ছে। ভাবলুম কি করা যায়। পকেটে একটিও পয়সা নেই। ক্ষুধা আর সহ্য হয় না। দু'একজন গঙ্গাস্নান যাত্রিণীদের কাছে হাত পেতে কেউ কেউ দু'পয়সা পাচ্ছে দেখে সাহস হল। আমিও হাত পাতলুম দু'একজনের কাছে, কিন্তু পয়সা না পেয়ে পেলুম ভর্ৎসনা ও তিরস্কার।

ভদ্রলোকের ছেলে। গায়ে দামী কাপড় জামা, পায়ে দামী জুতো! আমার আপাদমস্তক দেখে সবাই বললে—এই বয়সে নেশা ধরেছো, উচ্ছন্নে গেছো?

মনে একটা ঘৃণা হল। আর কারুর কাছে হাত পাতবো না ঠিক করে অন্যমনস্কভাবে পথ চলছি। টের পাইনি যে পাড়ার মধ্যে এসে পড়েছি। পাড়ার একজন পরিচিত লোক আমায় দেখতে পেয়ে একেবারে লাফ দিয়ে পড়ে, চোর থরার মতো আমাকে ধরে বাড়ীতে টেনে নিয়ে এলেন।

বাড়ীতে তখন আমার আদর যত্ন দেখে কে? হারানিধি ফিরে পেয়ে মার কি আনন্দ! একথালা খাবার সাজিয়ে এনে দিলেন। শুনলুম সারা রাত কেঁদেছেন। আর বাবা সারারাত থানায় থানায়, হাসপাতালে, আত্মীয়দের বাড়ী আমায় খুঁজে বেড়িয়েছেন!

কবিতা

শুভেচ্ছা

আজ তোমরা হ'লেও শিশু
ভবিষ্যতের শ্রেষ্ঠ মানুষ
নওতো কেবল হাওয়ার বেলুন
শূন্যে ভাসা ধোঁয়ার ফানুস!
এখন থেকেই চাই তোমাদের
উচ্চ আশা উদার মন,
তোমরা হবে দেশের নেতা
দশের গর্ব করার ধন!
সেই শিক্ষাই শিখ্‌বে যাতে
দেহের মনের বাড়বে বল,
তোমরা যেন করতে পারো
মাতৃভূমির মুখোজ্জ্বল!
বাংলাদেশের আশার স্বপন,
বাংলাভাষায় দিগ্বিজয়—
তোমাদেরই কীর্তি-গানে
সেদিন যেন পূর্ণ হয়।

খোকার প্রশ্ন

মানুষেরা মরে কি গো অশরীরী ভূত হয় ?
ভূত কি দেখেছে কেউ ? ভূতে কেন এত ভয় ?
ডাকে সব পশুপাখী ; বোবা কেন শুধু মাছ ?
বাড়ে দেখি, তবু কেন চলে না বলে না গাছ ?
কেঁচো আর সাপ কেন বিনা পায়ে বুকে হাঁটে ?
ঘাস কেন বেড়ে ওঠে বর্ষায় মাঠে মাঠে ?
বিনা তাঁতে মাকড়সা কী সুতোয় জাল বোনে ?
ঝুল কেন হয় এত বন্ধ ঘরের কোণে ?
পঙ্গপালের ঝাঁক কোথা থেকে এসে জোটে ?
মশা মাছি ঘরে কেন উৎপাত হয়ে ওঠে।
পিঁপড়ের মতো ক্ষুদে প্রাণী কেন জন্মায় ?
উই আর ইঁদুরেরা কাটে কেন যাহা পায় ?
হরিণের গায়ে কেন ছিট্ ছিট্ সাদা দাগ ?
গরু ঘোড়া গাড়ী টানে, টানে না সিংহী বাঘ ?
কেন কোন জন্তুর শিং আছে, কারো নেই ?
কারো খুর, কারো নখ, কেন যে তফাৎ এই ?
হাতী কেন শুঁড় পেলে, নাকে খাঁড়া গণ্ডার ?
গজদন্তের মতো দাঁত কেন নেই তার ?
ময়ূর পেখম ধরে, আর তো ধরে না কেউ ?
বাঘের পিছনে কেন শেয়ালেই ডাকে ফেউ ?
সজারুর কাঁটা কেন ? আর কারো নেই তো ?
জীবে এত ভেদ কেন ? সমস্যা এই তো ?

খুকুর প্রশ্ন

দিন কেন রাত হয়? কোথা চলে যায় আলো?
সূর্যি গরম কেন? চাঁদ কেন এত ভালো?
আকাশে এত তারা রোজ রোজ কেন ওঠে?
জ্যোৎস্না ফোটাতে কেন পারে নাকো এক জোটে?
মেঘের কোথায় দেশ? কোথা যায় ভেসে ভেসে?
লাল নীল সাদা সোনা উড়ে যায় কোন দেশে?
আকাশের আলো যত ওরা কেন দেয় ঢেকে?
কোথা ওরা জল পায়? ঝরে কেন থেকে থেকে?
কার ভয়ে চমকায় ঘন ঘন বিদ্যুৎ?
বাজের আওয়াজ কেন কান-ফাটা অদ্ভুত?
আকাশের শেষ কোথা? 'ছায়াপথ' কত আগে?
কেন বলো চাঁদে আর সূর্যে গ্রহণ লাগে?
শূন্য কি সব ফাঁকা? কিছুই নেই কি তাতে?
বাতাসের ছোঁয়া পাই, ধরা তো দেয় না হাতে?
চেহারা তো নেই তবু আলো কেন দেখা যায়?
অন্ধকার কি কানা? রাতে কেন হাতড়ায়?
ঠাণ্ডা চাঁদের আলো, রোদ কেন ওঠে তেতে?
ধুলোবালি ওড়ে কেন পথে পথে গাঁয়ে যেতে?
ভূমিকম্পেতে কেন বাড়ি করে টলমল?
জোয়ার ভাটার টানে বাড়ে কমে কেন জল?
ফুলে কেন রং এতো? গন্ধ এমন ভালো?
মানুষে ফর্সা কেউ, কেউ কেন এত কালো?
হাতে পায়ে নখ কেন? কেন কারো খুর নয়?
কুচ্‌-কুচে কালো চুল পেকে কেন সাদা হয়?
ছেলেদের কাছা-কোঁচা, মেয়েদের কেন নেই
ওঠে না তো গোঁফ দাড়ি—বসে বসে ভাবি এই!

হিংস্র বেশি বলবে কারে ?

সিংহ ব্যাঘ্র হিংস্র প্রাণী—
আমরা সবাই সেইটি জানি ;
ওই দু'টি জীব নির্বিচারে
মানুষ এবং জন্তু মারে।
দুর্নামটা রটান যাঁরা,
ভাবেন না কেউ ভুলেও তাঁরা—
সিংহ ব্যাঘ্র বনেই চরে,
হয় না হাজির তাঁদের ঘরে।
কিন্তু মানুষ মৃত্যু-পণে
সদলবলে ঢুকছে বনে
হরিণ পেলেও মারছে তারা
ভাবছ না ভাই—হিংস্র কারা ?
মানুষ যখন করেন এটা—
বলেন সবাই 'শিকার' সেটা !
জঙ্গলে জীব মারতে ছোটা—
নয় কি নিঠুর হত্যা ওটা ?
একটি ছাগল মারলে বাঘে
অমনি মানুষ ভীষণ রাগে ;
কিন্তু যখন আপনারা ভাই
মারেন দেদার—দোষ কিছু নাই !
সিংহ ব্যাঘ্র জন্তু ওরা,
কাজের মধ্যে বনেই ঘোরা ;
পশু পক্ষী ভিন্ন যে আর—
নেইক ওদের অন্য আহার।
কিন্তু মানুষ ক্ষেতের চাষে
ফসল ফলায় ঘরের পাশে !
খাচ্ছে তো সব অনর্গল,
শাক-সবজি নানান ফল।
নেইকো দেখি খাবার অভাব,
বিশ্রী তবু কি তার স্বভাব !
মাছ খাবে রোজ কাৎলা রুই,
চিংড়ি চুনোর সঙ্গে পুঁই।
এর ওপরও মাংস চাই,
মুরগি মটন যেটাই পাই ;
ডিমগুলো সব খাচ্ছে কাঁচা ;
পাখির ছানার মিছেই বাঁচা !
বাঘ মেরে ভাই খায় না বাঘে,
মানুষ কিন্তু পেলেই বাগে
রাগের মাথায় মানুষ মারে—
শেষ নাই তার অত্যাচারে।
খায় মেরে সে নিজের জাত ;
এর চেয়ে আর অধঃপাত—
হয়নি কারুর এ সংসারে
হিংস্র বেশি বলবে কারে ?

বিনা জলে স্নান

খোকা—

বিড়াল করে জলকে ভয়
তা' বলে সে নোংরা নয়!
গায়ে যখন ময়লা লাগে,
খস্‌খসে তার জিভের আগে—
সাফ্‌ করে নেয় সাফাই চেটে,
ঘণ্টাখানেক সাপ্‌টে খেটে!
চার পায়ে তার চারটি থাবা,
তুলোর গদি সুডোল ভাবা—
মেনির জিভের সঙ্গে জুটে,
গা মুছে দেয় আঁচড়ে খুঁটে।

খুকি—

কাঠ-বিড়ালও যায় না ফেলা—
খুব তাড়া তার স্নানের বেলা!
ধোয় জোরে মুখ দু'হাত ঘ'ষে
হাত-তালি ঠিক দিচ্ছে ক'সে!

খোকা—

ধূলোয় লুটে মুর্গীরা নায়;
চাতক তারও সেই উপায়।

খুকি—

বাদুড়, ছুঁচো, শেয়াল, তারা
নখ দিয়ে গা আঁচ্‌ড়ে সারা।

খোকা—

মাকড়সা কি অন্য পোকা
তারাও বড় নয়কো বোকা;
লক্‌লকে শুঁড় লট্‌কে ল্যাঙে'—
সাফ্‌ করে গা লম্বা ঠ্যাংএ!

খুকি—

অজগরের এক বছরে,—
অনেক বারই খোলস ঝরে;
এক পুরু ছাল ছাড়িয়ে ফেলে,
সাফ্‌ হয়ে যায় কেউটে কেলে!

বাবা না হাবা ?

বিশু বড় বদ্-ছেলে, খালি খেলে রাতদিন,
পড়া-শুনো ফেলে শুধু ঢোল পেটে তাক্‌ধিন !
বকে তাকে বাবা তার মারে ধরে যত,—
রেগে উঠে বিশু বেশি খেলা করে তত !
বিশুর একটা ভুটিয়ে কুকুর
ঘুমোয় লুটিয়ে সকাল দুপুর
বিশু বড় তাকে ভালবাসে,
কাছে রাখে থাকে আশে পাশে
মাঝে মাঝে নিয়ে ছাতে
ঘোরে ফেরে চেন হাতে

নাম তার 'হাবা'
বড় বড় থাবা
লোম ঝোলা,
ল্যাজ ফোলা
নাক,
শাঁখ !
চোখ
নখ
চক্ চকে,
ঝক্ ঝকে ।
একদিন তাকে
বেঁধে রেখে ফাঁকে
পড়ছে সে বোধোদয়
বিশুর মা এসে কয়
দেখ্ একবার উঠে ওরে,
হাবা বুঝি তোর গেছে মরে !
শুনে বিশু উঠে গেল নাকো ছুটে—
কাঁদলে না মোটে ঘরময় লুটে !
পড়া সেরে বিশু শেষে গিয়ে দেখে যেই
হাবা মরে পড়ে আছে আর বেঁচে নেই,
চেঁচিয়ে সে চিৎপাৎ, কেঁদে করে বাড়ী মাৎ,
গেল নাকো পাঠশালে, খেলে না সে মোটে ভাত
মা অবাক্ ! বলে হ্যাঁরে ব্যাপার কি বল্‌তো রে ?
কাঁদলিনি সকালে তো শুনে হাবা গেছে মরে !
বিশু কেঁদে বলে—কই বলোনি তো হাবা,
তুমি তো তখন এসে বললে সে-বাবা !

শেয়ান শেয়ালের বোকাবুদ্ধি

দীনু ঘরামী ঘর বানাতো চিরে বাখারি শক্ত বাঁশ,
ঘরে ছিল তার একটি পোষা নধর মোটা বাচ্চা হাঁস।
হাঁসটা খেত পান্তা ভাতের, ফেন আমানি খুদের কুঁড়ো,
চ্যাপটা ঠোঁটে সাব্‌ড়াতো সব রাখতো নাকো একটু গুঁড়ো।
সকাল সাঁঝে দীঘের মাঝে ভাসতো সুখে সাঁতার দিয়ে,
দীনুর ছেলে দীনুর মেয়ে খেলতো তাকে সঙ্গে নিয়ে।

গাঁয়ের শেষে বনের পাশে একটা ছিল সেয়ানা শেয়াল,
হাঁসের মাংস খাবার লোভে হঠাৎ শেয়ালের জাগলো খেয়াল।
সন্ধ্যেবেলায় লুকিয়ে এসে দীনুর বাড়ি মারলে উঁকি,
দেখলে খোকা খেলছে ঘরে, পুতুল নিয়ে ব্যস্ত খুকি।
হেঁসেল ঘেঁষে পাঁশের গাদা, তার ওপরে হাঁসের ছানা,
খুবরি কেটে থেবড়ে বসে ঠুকরে ঠোঁটে ঝাড়ছে ডানা।
সুযোগ বুঝে হাঁসকে গিয়ে খ্যাঁক করে সে ধরলো জোরে,
প্যাঁক্ করে না উঠতে তাকে বাগিয়ে ধ'রে পড়লো সরে।
পুকুর পাড়ে পথের ধারে গড়াচ্ছিল একটা ঢোল,
শেয়ালের পায়ের ঠোকরে তায় উঠলো বেজে মিষ্টি বোল।
চম্‌কে শেয়াল থম্‌কে গেল তাক্-ধিন্-তাক্ শুনতে পেয়ে,
ভাবলে এটা বেশ পাখি তো! ডাকছে ভালো হাঁসের চেয়ে!
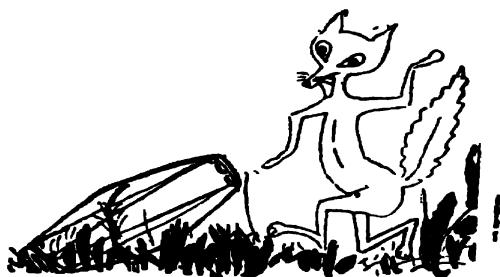
মিষ্টি এত গলাটি যার, মাংস হবেই চমৎকার,
এই না ভেবে হাঁসকে ছেড়ে ঢোল নিয়ে সে পগার পার

ঢোলের পেটে মারলো কামড় আহ্লাদে সে বাসায় এসে,
টাক্-ডুমা-ডুম্ বেজে দু'বার শেষটা গেল ঢোলটা ফেঁসে।
ঢোলের ফাঁসা খোলের পেটে সেয়ানা শেয়াল মুখটা গুঁজে,
হাড় পাঁজরা নাড়ি ভুঁড়ি বা রক্ত মাংস পায় না খুঁজে।

আঁচড়ে যত কামড়ে ধরে বেজে গুড়্‌গুড়্ গড়ায় ঢোল,
শেষটা শেয়ালের গোটা মাথাটাই আটকে ধরে ঢোলের খোল।
যতই মাথা বাড়ছে তত পড়ছে ছিঁড়ে গোঁফের চুল,
বুঝলে শেয়াল হাঁসটা ছেড়ে করেছে এক বিষম ভুল।
হাতের ছেড়ে এমন তেড়ে লোভের বশে যে জন যায়,
ভেস্তে দু'টোই পস্তে শেষে এই রকমই কষ্ট পায়।

জংগলের দংগলে

তখনো হয়নি ভোর,
সারা বন ঘুমে ঘোর,
শেষ রাত্রে উঠে শুধু হাতী,

শুঁড় নেড়ে, সুর কোরে
পড়ছিল জোরে জোরে
ঝোপের আড়ালে জেলে বাতি।
ঘুম ভেঙে যেতে ব্যাঙ্
রেগে এসে মারে ল্যাঙ্
ল্যাঙ্ খেয়ে হাতী কুপোকাৎ!
ব্যাঙের ফুলিয়ে গলা
ঠ্যাঙ্ ছুঁড়ে সে কি চলা
কোনো দিকে নেই দৃক্‌পাত!
দেখে জলে ওঠে রাগ,
লাফ দিয়ে এলো বাঘ
'হালুম!' হাঁকড়ে পড়ে ঘাড়ে।
ব্যাঙ টেনে মারে চড়
বাঘ ক'রে ধড়ফড়,
'বাঁচাও কে আছে?' ডাক ছাড়ে।

শুনি সে কাতর স্বর
ভেঙে গেল ঘর ঘর
পশুপাখী সকলের ঘুম,
করি মহা কলরব
সেখানে ছুটিল সব
দেখে চেয়ে লড়ায়ের ধুম!
ব্যাঙে মারে চড় বাঘে?
দেখে সব তাক লাগে!
ভিড় জমে গেল বন ঘিরে;

সিংহ কেশর নাড়ে
ভাল্লুকে লোম ঝাড়ে
নেকড়ে গুটোয় ল্যাজ ধীরে
শূকরে শানায় দাঁত,
গরিলারা জোড়হাত;
খড়্গ বাগায় গণ্ডারে,
'হিপো' জলে তোলে হাই
কুমীরেরা মারে ঘাই
ভোঁদড় তাগাড়ে ডুব মারে

শিঙ নাড়ে ষাঁড় এসে
কুকুর বিড়াল দেশে
ঝগড়া গিয়েছে যেন ভুলে।
হরিণ তাকায় মিহি,
ঘোড়া ডাকে চিঁহি হিঁহি,
গাধা খাড়া দুই কান তুলে।
ফণা ধরে অজগর,
নেউলের এলো জ্বর,
খরগোসে বুজে থাকে চোখ
ব্যাঙে বাঘে জংগলে
লড়ে যায় দংগলে
দু'জনেরই বেড়ে ওঠে রোখ!

ব্যাঙ শেষে মারে লাথি,
ফাটলো বাঘের ছাতি!
পালালো সবাই ছেড়ে বন।
একা শুধু দেখি হাতী
শুঁড়ে তুলে ধরে বাতি
আবার পড়ায় দিল মন।
ব্যাঙে মেরে ফেলে বাঘ,
ছিছি, শুনে বাড়ে রাগ
হাতী আর কার কাছে কবে?
হাতীর সাহস দেখে,
ঝোপে ঝাড়ে এঁকে বেঁকে
গুটি গুটি ফিরে এলো সবে।

রাক্ষুসীর গল্প

শোন মন দিয়ে মোনা,
ওরে ধনা, টিয়ে, সোনা,
সরে এসে বোস কাছে ;
এক দেশে তাল গাছে
ছিল এক রাক্ষুসী
খেতো ধরে যাকে খুসি

কেউ তেড়ে গিয়ে তাকে
ঝেড়ে ঘুষি জোরে নাকে
খোঁচা মেরে ওঁচা পেটে
পারে যদি দিতে সেঁটে
কান কেটে চুল ছেঁটে
জিভ টেনে বেঁধে এঁটে
আনে যদি রাজা দেখে
লাখ টাকা দেবে ডেকে !
শুনে সেটা রামদাস
ভারি বীর এয়া লাশ !
দাঁতে ঢেঁকি হাতে বাঁশ
লাখ টাকা ক'রে আশ
বলে এসে মহারাজ
অনুমতি পেলে আজ
ফতে করে আসি কাজ !
রাজা দেখে তার সাজ
ভাবে এটা দম্-বাজ
বলে তোর নেই লাজ
রাক্ষুসী ধরে মারা
শক্ত সে কাজ পারা

কেন শেষে যাবি মারা।
তোর আগে গেছে যারা
ফেরেনি রে কেউ তারা
তাই আমি ভেবে সারা !
রামদাস বলে সে কি ?
আমি তবে নিয়ে ঢেঁকি
একবার গিয়ে দেখি
তারা সব মরেছে কি,
রাক্ষুসী করেছে কি,
মেরে তাকে যদি ঢেঁকি
ছেড়ে ঢেঁকি দেড় মুণে
লাখ টাকা নেবো গুণে।
রাজা হেসে বলে শুনে
তুই ঠিক পাকা খুনে
যারে তবে যদি খুসি
মেরে আয় রাক্ষুসি,
ফিরে এনে গুণে নিস্
লাখ টাকা বখ্শিস।
মঞ্জুর সুপারিশ !
শুনে হাত নিশ্পিস্

রামদাস ছেড়ে হাঁফ্
দুই বাঁশে দিয়ে চাপ
ঢেঁকি দাঁতে মেরে লাফ
ছুটে চলে গেল সাফ্!
রাক্ষুসি দেখে তাকে
হাঁউ মাউ করে হাঁকে
রামদাস সেই ফাঁকে
দিলে পুরে তার নাকে
দুই হাতে দুই বাঁশ।
রাক্ষুসি হাঁস্ ফাঁশ!
দূর থেকে রামদাস
বলে আর খাবি মাস?
রাক্ষুসি রেগে নাচে
নাকে বাঁশ খালি হাঁচে!
রামদাস ঠেলে আছে
বাঁশ খুলে পড়ে পাছে
নাক উড়ে মাথা খুঁড়ে
বাঁশ দু'টো এল ফুঁড়ে
রাক্ষুসি জ্বলে পুড়ে
চিৎপাত মাটি জুড়ে।
রামদাস নয় কুঁড়ে
মেরে তাকে ঢেঁকি ছুঁড়ে
আঁশ বঁটি এক চুঁড়ে
নিলে কেটে পাতা মুড়ে
নাক, কান, জিভ তার।
পরদিনে দরবার
এসে বলে এইবার
লাখ টাকা ক'র বার
মেরেছি তো রাক্ষুসি
হাত থেঁতো মাথা ভুসি

টাকা দিয়ে কর খুসি
কেন রাজা হবে দুষি
নাক, কান, জিভ চুল
মড়া হাড়ে গড়া দুল
দাঁতে গাঁথা নাক ফুল
দেখে নাও নেই ভুল।
রাজা দেখে বলে ইস্!
তাইতো রে মেরেছিস্!
দেখছি যে গায়ে তোর
সত্যিই ভারি জোর!
মন্ত্রীকে বলে ডেকে
লাখ টাকা দাও একে
রামদাস বীর অতি
আজ থেকে সেনাপতি!
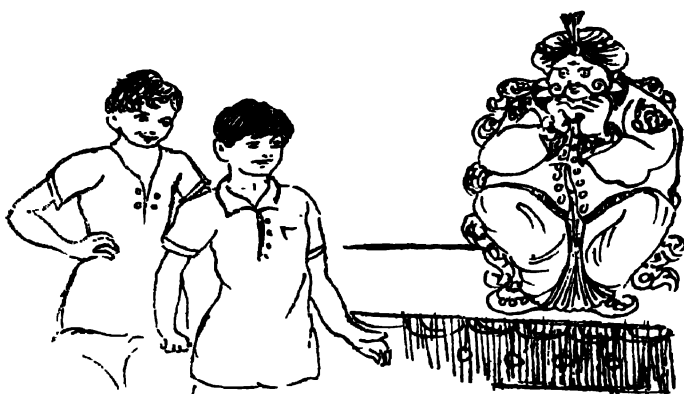
সুমাত্রা কাহিনী

ও দেশের দুটি ভাই, রাম শ্যাম ভেদ নাই, ভেদ শুধু স্বভাবে,
ছিল যারা গেছে মারা, অনাথ আতুর তারা পিতামাতা অভাবে।
একটি যা পায় খায়, অন্যটি আরও চায়, লোভ তার ভোজনে,
কাজেই হালকা শ্যাম, ওদিকে পেটুক রাম বেড়ে চলে ওজনে!

একদা খবর পেলে রাণীর হয়নি ছেলে, রাজা খোঁজে পোষ্য;
শুনে তারা গেল ছুটে; মন্ত্রী বলেন উঠে নাকে গুঁজে নস্য,
রূপ আছে; গুণ বলো; রাজার কাছেই চলো, তিনি চান শিক্ষা,
তাঁর মতে রূপ ছার, আছে ভালো গুণ যার, চান তারে ভিক্ষা।

'রাজা' দেখে রাম শ্যাম ভয়ে কাঠ, ঝরে ঘাম, সরে নাকো দৃষ্টি;
রাজা কন কাছে ডেকে, থাকো হেথা আজ থেকে, ভাষা ভারি মিষ্টি।
যোগ্যতা বেশি কার পরীক্ষা হবে তার; বিদ্যা ও বুদ্ধি
দু'ই আছে যার মাঝে, যোগ্য সে যুবরাজে করে নেব শুদ্ধি!

সুমাত্রা রাজপুরে রাণীর মহলে ঘুরে সুখে থাকে দু'জনে,
হেসে খেলে দিন চলে, ভালো যারা ভালো বলে, গাল দেয় কু'জনে।
একদিন রাজা ডেকে, বলেন, এসতো দেখে ঘুরে সারা প্রাসাদে!
শুনে তারা গেল ছুটে নেচে কুঁদে ছাদে উঠে, পড়ে শেষে ফ্যাসাদে।

ছাদে রোদে যায় প্রাণ, সিঁড়ি খুঁজে হয়রান, মাথা ওঠে ঘুলিয়ে,
নামার পায় না পথ, যত করে কসরত তত যায় গুলিয়ে।
কাঁপে রাম থর্‌থর্ : ভয়ে কাঁদে, আসে জ্বর, প্রাণ বুঝি রয় না,
শ্যাম ডেকে বলে, রাম, দোহাই একটু থাম ; নাকে কাঁদা সয় না।

চল যাই ওই দিকে, কে যেন কী গেছে লিখে, চিলে-কোঠা-দেয়ালে,
হয়তো বা হ'তে পারে—লিখে গেছে বারে বারে নাম কেউ খেয়ালে।
রাম কেঁদে বলে, ছাড়্, দেখ না মড়ার হাড় ওইখানে ছড়ানো,
যাব না ওদিকে ভাই, যদি পড়ে মরে যাই, ছাদটা যা গড়ানো।

শ্যাম একা গিয়ে শেষে লেখা পড়ে ওঠে হেসে, পথ আঁকা পাথরে।
সেই পথে সহজেই শ্যাম নেমে গেল যেই, রাম কাঁদে কাতরে।
রাজা তাকে একা দেখে, বলে, কোথা এলে রেখে রামগুণধামকে ?
শ্যাম বলে, এল না সে, পথ পেয়ে উল্লাসে ডাকলে সে রামকে—

রাম বড় পেলে ভয়, পথটাও সোজা নয়, ঢালু হ'য়ে নেমেছে,
সে পথে ছড়ানো হাড়, ভূতে পাছে ভাঙে ঘাড়, এই ভয়ে ঘেমেছে।
রাজা লোকজন ডেকে পাঠালেন ছাদ থেকে রামধনে আনতে,
ছাদে গিয়ে দেখে তারা, রাম ভয়ে গেছে মারা আল্‌সের প্রান্তে।

ছাদে যারা মরে থাকে, নামানো হয় না তাকে, হাড় তাই জমেছে,
হ'য়ে ছাদে পথহারা প্রায় তারা যায় মারা, ভয়ে যারা দমেছে।
শ্যাম বলে, মহারাজ, নিয়ম করুন আজ, ছাদে যারা চড়বে,
নামার নক্‌শা নিয়ে, ওঠে যেন তারা গিয়ে, ভুল হলে পড়বে।

রাজা শুনে খুশি মনে বলেন মন্ত্রীগণে, কর এক কার্য,
এ ছেলেটি বড় ভালো রূপে গুণে ঘর আলো, একে দাও রাজ্য ;
শুনে সবে এক মত সাজানো নগর পথ, শুরু শোভাযাত্রা,
শ্যাম সেজে যুবরাজ হাতি চড়ে চলে আজ উজলি' সুমাত্রা।